লোকসংস্কৃতি

মাহমুদ শফিক

লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি

মাহমুদ শফিক

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশ ❑ নভেম্বর ২০০৫

গ্রন্থের নাম : লোকসংস্কৃতি ॥ লেখক : মাহমুদ শফিক

(স্ব) কাশফিয়া শফিক মম

প্রচ্ছদ : মোঃ মোখলেছুর রহমান
প্রকাশক : শফিক-উল-ইসলাম
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
মুদ্রণ : মেমোরী, শেওড়াপাড়া, ঢাকা।
মূল্য : ১৫০.০০ টাকা (টাকা : একশত পঞ্চাশ মাত্র)
ISBN : 984-32-2650-4

উৎসর্গ

কবি আতাহার খান
বন্ধুবরেষু

ভূমিকা

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে কৃষি সভ্যতা গড়ে ওঠার মূলে ছিল এ অঞ্চলের উর্বর ভূমি ও সুপেয় পানি। এখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় নদী। নদীগুলো নৌপথ রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথ ব্যবহার করেই অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশ উপমহাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সুতিবস্ত্র মসলিন তৈরি হতো বাংলাদেশে। মসলিন ছিল মোঘল সম্রাটদের প্রিয় বস্ত্র। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মসলিনকে ব্যবহার করতেন ফ্যাশন হিসাবে। সোনারগাঁয়ের চিত্রিত ঘোড়া ও হাতি ছিল সারা ভারতবর্ষে জনপ্রিয়।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ কারণে গ্রামের জনগণকে নিজেদের বাইরে যেতে হতো না। আশে-পাশের হাট বাজার ও মেলায় পাওয়া যেত প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী। গ্রামে গ্রামে উৎপাদিত হতো কাঁসা-পিতল-তামা, কাঠ-বাঁশ-বেত এবং লোহা-মাটির কারুপণ্য। বাংলাদেশের নকশিকাঁথার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। নগরায়নের প্রভাবে কারুশিল্পীদের জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি শ্রমিকদের চেয়েও তাদের দৈনিক গড় আয় অনেক কম। এ কারণেই হারিয়ে গিয়েছে অনেক কারুপণ্য। সম্প্রদায়গত পেশা পা বাড়িয়েছে অবলুপ্তির পথে।

আট বেহারার পালকি ডেকোরেশন পিস হিসাবে প্রবেশ করেছে ড্রয়িং রুমে। কাঠের তৈরি একতারা আর দোতারার মতো সংগীত যন্ত্রের কদর কমে গিয়েছে। তামা-কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র অপসাধিত হয়েছে নিজের স্থান থেকে। মাটির তৈজসপত্রের স্থান দখল করে নিয়েছে এ্যালুমিনিয়াম ও মেলামাইনের তৈজসপত্র। গ্রাম জুড়ে শুরু হয়েছে পরিবারের ভাঙন। নদীর ভাঙনের মতো ভেঙেছে কারুশিল্পীদের পেশা। কারিগরি উৎপাদন প্রথার স্থান দখল করে নিয়েছে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি।

একটি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস হচ্ছে তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং উৎপাদন যন্ত্রের ধারাবাহিক বিকাশ। তাই আমাদের গৌরবময় অতীতকে মুছে ফেলার সুযোগ নেই। কৃষক ও কারুশিল্পীরাই এদেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে। তারা যেমন আমাদের পারিবারিক চাহিদা মিটিয়েছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে কালজয়ী শিল্পকর্ম। তাদের উৎপাদন শৈলীর সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে কারুশিল্পগ্রাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রতিটি প্রকল্পই যথাসময়ে শেষ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তার নির্দেশেই অতি দ্রুত 'সোনারগাঁয়ে কারুশিল্পগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প' শেষ করা হয়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থ বছরে 'সোনারগাঁয়ে কারুশিল্প গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প'-এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ২০০৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক মো: রেজাউল করিম। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান। বিশেষ

বক্তা ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য আতাউর রহমান আঙ্গুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মানিত সচিব কাজী আবুল কাশেম।

মাননীয় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সুযোগ্য নির্দেশনায় সৃষ্টি হয়েছে শত শত সাংস্কৃতিক কর্মী। এ কারণেই 'সোনারগাঁয়ে কারুশিল্প গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প'-এর উদ্বোধন করায় তার ভক্তরা খুশি হয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পতাকা তলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একজন বলিষ্ঠ সৈনিক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার জন্য সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তার অনুপ্রেরণায় প্রণীত 'প্রিয়জনকে বই উপহার কর্মসূচি' সমাজে সৃষ্টি করেছে জাগরণ। লোকসংস্কৃতি গ্রন্থটি তারই ফল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই অতি দ্রুত সোনারগাঁয়ে কারুশিল্প গ্রাম নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এটি একটি মাইল ফলক। এদেশের লোকসংস্কৃতির প্রতি তিনি যে অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন, ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে গিয়েছে।

লোকসংস্কৃতি গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজতি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমানের কাছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব এহসান শামীরের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তার ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। এটা সংস্কৃতির জন্য নিশ্চয়ই একটি সুখকর বিষয়।

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে ড. বিশ্বনাথ সরকার ও মোঃ রবিউল ইসলাম আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাদের পরামর্শ আমার কাজে লেগেছে। আমার লেখার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় উৎসাহদাতা আমার বন্ধু বিশিষ্ট সাংবাদিক মারুফ কামাল খান। আমার স্ত্রী নাজমা গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। আমার মেয়ে কাশফিয়া শফিক মম আমার সঙ্গে রাত জেগেছে। বই লেখার ক্ষেত্রে এটাই-ই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমার মেয়ের মধ্যে আমি আমার মুক্তিযোদ্ধা মা সাকিনা বেগমকে খুঁজে পাই। তাদের সকলের কাছেই রয়েছে আমার অপরিশোধ্য ঋণ।

মাহমুদ শফিক
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ : নভেম্বর ২০০৫

সূচিপত্র

অধ্যায় :	এক	১১	উৎসের সন্ধানে
অধ্যায় :	দুই	৪২	গঙ্গারিডি থেকে সোনারগাঁও
অধ্যায় :	তিন	৫০	মানুষের অভিযান
অধ্যায় :	চার	৫৮	সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সমন্বয়
অধ্যায় :	পাঁচ	৭২	চীনের স্বাতন্ত্র্য
অধ্যায় :	ছয়	৮৭	বাঙালি থেকে বাংলাদেশী
অধ্যায় :	সাত	৯৯	কৃত্য ও থিয়েটার
অধ্যায় :	আট	১২৬	উৎপাদন সংস্কৃতি
অধ্যায় :	নয়	১৩৫	কৃষকের প্রতিকৃতি
অধ্যায় :	দশ	১৪৫	পদ্মার তীরে জনগণ

উৎসের সন্ধানে

অসহায় মানুষ আবহমান কাল ধরে মনোজগতে অনুসন্ধান করেছে এমন এক বীরের চরিত্র, যে তাকে মুক্তি দেবে সকল অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতন থেকে। সে বাস্তবে এমন বীরের সন্ধান পায়নি বলেই কল্পনার মাধ্যমে প্রতীকায়িত করেছে কাঙ্ক্ষিত বীরের চরিত্র। এভাবেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে লোকগাঁথায় বীরের জন্ম হয়েছে। এক সময় বীরকে বলা হতো অবতার। যেমন ছিল কৃষ্ণ। সে গোয়ালার ঘরে মানুষ হয়ে বধ করেছে অত্যাচারী রাজা কংসকে। মানুষ কৃষ্ণকে ভেবেছে অতিমানব কিংবা অবতার অর্থাৎ মানুষের কায়ায় ঈশ্বর। এভাবেই মানুষ কল্পনায় সৃষ্টি করেছে হারকিউলিসকে, যে পেশীশক্তি দিয়ে উঁচু করে ফেলতে পারে পৃথিবীটাকে।

সাঁওতালদের মধ্যে একটি লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে, যার নাম ফতে মাঝির গল্প। সাঁওতাল ভাষায় নেতা মানে হচ্ছে মাঝি। মাঝির বীর গাঁথা নিয়েই প্রচলিত হয়েছে ফতে মাঝির রূপকথা। ফতে মাঝি এমন একজন বীর ছিল, যে শুঁড় ধরে আছাড় দিয়ে মারতে পারত হাতি। কোনো কিছু শিকার করতে তার একটি তীরের বেশি দুটি তীর লাগত না। এ ধরনের কল্পকাহিনীর মাধ্যমে অনেক মানুষ স্বপ্ন দেখে একসঙ্গে। মানুষের অসাধ্য বাসনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে ভীষ্ম স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে। অর্জুনের শর নিক্ষেপে খরাদগ্ধ প্রান্তরে বৃষ্টি হয়। আশ্চর্যজগত দেখে আসে অডিসির জাহাজ।

এদেশের মানুষের মধ্যে দৈত্য-দানবের গল্প বেশ জনপ্রিয়। দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে কল্পনার রঙ লাগানো অতিমানব। একে বিজ্ঞান দিয়েছে সাবলীল গতি। আধুনিক সমাজে রবিনহুডের বাণ কাজে লাগে না। কারণ, কল্পকাহিনীতে বিজ্ঞান নিয়ে এসেছে বিশ্বাসযোগ্যতা। মানুষ আদিম অবস্থা থেকে যতই অগ্রসর হয়েছে, তার কাছে জীবনের অর্থ ততই গভীর হয়েছে।

লুইস হেনরি মর্গান বলেছেন, 'মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ক্রমশ: বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে সে উদ্ভাবন করেছে উন্নয়নের নতুন নতুন পদ্ধতি। এর ফলে বদলে গিয়েছে সমাজ।' যারা প্রথম পশু পালন করেছে, তারা খেতে পেয়েছে উন্নততর খাদ্য। খাদ্য তাদের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়িয়েছে। ফলে তাদের পক্ষে উন্নত মানের কলকব্জা ও হাতিয়ার উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। পশু পালন শুধু খাদ্যের অভাবই দূর করেনি, সেই সঙ্গে লাঙল দিয়ে জমি চাষের উপায় উদ্ভাবনের সৃষ্টিশীলতা দান করেছে মানুষকে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবনে চিন্তা করার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতা সৃষ্টির নতুন পটভূমি। মানুষ আগুন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রকৃতির একটি বিরাট শক্তিকে বশীভূত করেছে। প্রকৃতির এই শক্তির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে সে নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর ফলে সে পশু থেকে পৃথক হয়ে মানবিক গুণপ্রাপ্ত হয়েছে। গর্ডন চাইল্ড বলেছেন, 'মানুষ আগুন আবিষ্কারের মাধ্যমে একটি বৈপ্লবিক উত্তরণের পথে অগ্রসর হয়েছে।'

আগুনের সাহায্যে মানুষ গুহার অন্ধকার দূর করেছে। আর মনের অন্ধকার দূর করেছে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে। মৃৎ ও ধাতুরপাত্র নির্মাণ কৌশল আবিষ্কার আগুন আবিষ্কারেরই ফল। এভাবেই রচিত হয়েছে প্রোমিথিউসের আগুন ছিনিয়ে আনার উপখ্যান। মৃৎপাত্র নির্মাণের মাধ্যমে মানুষ একটি জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনকেই সম্পন্ন করেছে। কুম্ভকার ৬০০ ডিগ্রি উত্তাপের মাধ্যমে জমাটবাঁধা মাটির জলের অণু দূর করে মাটির পাত্র তৈরির কাজ সম্পাদন করেছে। এর মাধ্যমে সে সৃষ্টির আনন্দ লাভ করেছে। এভাবেই মানুষ দানবিক শক্তির উপর আরোপ করেছে মানবিক গুণ। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কল্পকাহিনীর জেমস বন্ড সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষ হিসাবে। কিন্তু সে মানব বিরোধী মিসাইলের গতি প্রতিরোধ করতে পারে না। তা পারে সুপারম্যান। সে মিসাইলের গতি রোধ করে ছুঁড়ে দিতে পারে মহাশূন্যে।

যুদ্ধ অনেক মায়ের কোল খালি করেছে, যার জন্য সৃষ্টি হয়েছে র‍্যাম্বো। র‍্যাম্বো একাই পারে একটি পুরো বাহিনীর বিনাশ ঘটাতে। এভাবেই যুগমানসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার রঙ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু শয়তান ও ফেরেশতার সংঘাতের অবসান হয়নি। এ কারণে মানুষের মনে রয়ে গিয়েছে শুভ ও অশুভ চিন্তার দ্বন্দ্ব। শুভ চিন্তার বিকাশ ঘটাতে গিয়েই একজন নির্যাতিত কৃষক তীতুমীর মানুষের কাছে হয়ে যান বীর।

তীতুমীর ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি তার সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাড়িত হয়ে পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তার কল্যাণমূলক ভাবনা তাকে অতিমানবে পরিণত করেছে। এভাবেই ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের প্রতিটি মানুষ মুক্তচিন্তা দ্বারা তাড়িত হয়ে অতিমানবে পরিণত হয়েছেন।

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে হিংস্র প্রাণীও বাঁচতে পারে না। এরা বিপদ দেখলেই নিজের আবাসস্থল ত্যাগ করে। কিন্তু মানুষ তা করে না। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় কিংবা প্রবল বন্যা মানুষের আবাসস্থল ধ্বংস করে দেয়। এরপরও মানুষ নিজের স্থানের মায়া ত্যাগ করে না। ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর মানুষ নিজের হাতেই আশ্রয় স্থল গড়ে তোলে। ধ্বংস ও সৃষ্টির এ খেলা মানুষকে একজন শিল্পী হিসাবে গড়ে তুলেছে। এরপরও মানুষের মনে রয়ে গিয়েছে কুসংস্কারের অন্ধকার।

স্বপ্ন মানুষের মনে বিস্ময় ও ভীতির জন্ম দিয়েছে। এখনো অনেকে বিশ্বাস করে মহিষ স্বপ্ন দেখলে কারো মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, মহিষ মৃত্যুর দেবতা যমরাজার বাহন। সাদা হাতি স্বপ্ন দেখার মধ্যে রয়েছে মহাপুরুষের জন্মের ইংগিত। বুদ্ধদেবের জন্মের আগে তার মা নাকি একটি সাদা হাতিকে তার দেহের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে দেখছেন। হয়ত তা থেকেই জন্ম হয়েছে এই সংস্কারের। স্বপ্ন নিয়ে এমন সংস্কার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার জাদুকে যোগী-ঋষিদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা হতো। জুন মাসের তৃতীয় দিনে বুলগেরিয়ার বার্গাস বন্দরের কাছে একটি গ্রামে কিছু ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি নাচতে নাচতে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যান। দ্রুত পদ সঞ্চালনের মাধ্যমেই তারা এই ক্ষমতা রপ্ত করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা অলৌকিক আধার হিসাবে গণ্য করে। অনেকেই বিশ্বাস করেন, পেঁচার ডাক মৃত্যুর বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ঋগ্বেদে আছে, "পেঁচার ডাক মিথ্যা হোক।"

আসলে মৃত্যু হচ্ছে এক জৈবিক প্রক্রিয়া। যেমন মোমবাতির জ্বলন্ত শিখার সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং তাপশক্তি নির্গত হয়, তেমনি অগণিত জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ বেঁচে থাকে। পেঁচা কিংবা কাকের ডাকে তা ধ্বংস হয় না। মৃত্যুকে ভয় পায় বলেই মানুষের মনে আত্মার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর মানুষই কল্পনার মাধ্যমে আত্মাকে দিয়েছে অমরত্ব। অমরত্বের ধারণা থেকেই চিন্তার জগত প্রসারিত হয়েছে। মানুষ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ ও বিপ্লবে অংশ নিয়েছে।

রোমের সৃষ্টি ফরাসি বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছে। একইভাবে ফরাসি বিপ্লবের মুক্তচিন্তার অনুভূতি মানুষকে নিষ্কলুষ ব্যক্তিতে প্রত্যাবর্তনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সক্রেটিস মানব জাতিকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন, মহৎ চিন্তার মৃত্যু ঘটে না। এভাবেই দর্শনের নীতিবাক্যগুলো মানুষকে মহৎ উপলব্ধির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

গারোরা নিজের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে। কারণ, তারা প্রবল আগ্রাসনের পরও পাহাড়ের মায়া ত্যাগ করেনি। যে সব উপজাতি পাহাড়ের মায়া ত্যাগ করে সমতল ভূমিতে পা রেখেছে, তারা হয়েছে বৈষ্ণব, শৈব কিংবা বাউল। আর গারোরা চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকা থেকে শুরু করে তিব্বত, বার্মাসহ বিভিন্ন স্থানে নিজেদের বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করেছে। তাই তারা টিকে আছে। বীররা শুধু বিজয় অর্জনই করে না, তাদের মধ্যে দুর্ভোগ সহ্য করার ক্ষমতাও রয়েছে। মানুষ শাশ্বত কালের জয়গান-ই গায়নি, চরম দুর্ভোগ সহ্য করে নিজের জন্য বাসভূমি প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষই পাথর যুগকে আকাশ সংস্কৃতির যুগে পরিণত করেছে।

পাথর যুগে কোনো নগর গড়ে ওঠেনি। তখন মানুষ লিখতে শিখেনি। সে সময় মানুষের প্রধান অস্ত্র ছিল তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পাথরের টুকরো। আদি মানবের সময়কাল পাথর যুগ নামে পরিচিত। পাথর যুগের প্রথম পর্বকে বলা হয় পুরোনো পাথর যুগ বা পুরোপলীয় যুগ। পুরোপলীয় যুগের মানুষ ছিল যাযাবর। তখন মানুষ শিকারের প্রয়োজনে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ধীরে ধীরে মানুষের শিকারী জীবনের অবসান ঘটে। আবিষ্কৃত হয় কৃষিকাজ। এ সময়কে বলা হয় নতুন পাথর যুগ বা নবোপলীয় যুগ। ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ একত্রিত হয়েছে এবং গড়ে তুলেছে সমাজ জীবন। সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম। নগর গড়ে উঠেছে আরো অনেক পরে।

পাথর যুগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হিসাবে পরিচিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন ঘটেছে সভ্যতার যুগের। সভ্যতার যুগের প্রধান

দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষ কর্তৃক লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং নগর সংস্কৃতির উদ্বোধন। বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে। মিশরের নীল নদ, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী, ভারতের সিন্ধু নদ এবং চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উর্বর ভূমিতে গড়ে উঠেছে বিশ্বের প্রাচীনতম নগর সভ্যতা। এসব সভ্যতা গড়ে ওঠার সময় পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন আসে। ব্যাপক বৃষ্টিপাতের দরুণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নদীর দুকূল উপচে বন্যার পানি বয়ে যায়। কিন্তু মানুষ সংকটের মুখে থেমে থাকেনি। মিশরের মানুষ বন্যা ঠেকানোর জন্য উদ্ভাবন করেছে বাঁধ দেয়ার পদ্ধতি। একই সঙ্গে তারা বন্যার পানি ধরে রেখে খাল কেটে কৃষি জমিতে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখেছে। এভাবেই প্রাচীন মিশরে গড়ে উঠেছে এক প্রকার সেচ ব্যবস্থা। সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন যৌথ শ্রমের। জীবনের প্রয়োজনেই মিশরের মানুষ দলে দলে জমা হয়েছে নীল নদের চারপাশে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাথর যুগের অবসান হয়েছে।

মানুষ খনি থেকে তামা ও টিন আহরণের পদ্ধতি শিখেছে। তারা এ দুটি ধাতু মিশিয়ে তৈরি করেছে ব্রোঞ্জের অস্ত্র। তাদের কাছে ব্রোঞ্জের অস্ত্র কার্যকর মনে হয়েছে। ফলে নীল নদের চারপাশে গড়ে উঠেছে তামা এবং টিনের কারখানা। এসব কারখানা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে প্রশাসন ব্যবস্থার। মিশরের মানুষ প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্বাচন করেছে দলপতি। এভাবেই গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র। প্রাচীন মিশরে রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন রাজা। প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো 'ফারাও'। ফারাওদের দক্ষ প্রশাসন পরিচালনায় মিশরের চেহারা পাল্টে গিয়েছে। তাদের আমলে তৈরি হয়েছে রাস্তাঘাট আর দালান-কোঠা। নবোপলীয় গ্রামীণ সভ্যতার চেহারা পাল্টে গিয়ে নীল নদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছে নগর সভ্যতা। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে বলেছেন 'নীল নদের দান'।

মিশরের অর্থনীতির মূল শক্তি ছিল কৃষি। ৪,৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয়রা শুরু করেছিল লাঙলের ব্যবহার। তাদের উৎপাদিত প্রধান ফসল ছিল গম, যব, তুলা, পিচ ও পেঁয়াজ। সে সময় মিশর থেকে ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় রফতানি হতো গম, লিনেন কাপড়, মাটির পাত্র ও কাঁচ। প্রায় একই সময় মিশরের মতো আজকের ইরাক অঞ্চলে গড়ে উঠেছে মেসোপটেমিয়ার নগর সভ্যতা।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, আমেরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা। মিশরীয় সভ্যতার কাছাকাছি সময়ে নির্মিত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা। হরপ্পা নগরীটি গড়ে উঠেছে সিন্ধু উপনদী রাভীর তীরে। সিন্ধু

সভ্যতায় পাওয়া গিয়েছে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন, ডাস্টবিন, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট এবং সারিবদ্ধ লাইটপোস্ট। শত্রুর আক্রমণ থেকে নগরকে রক্ষা করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে সুরক্ষিত দুর্গ।

সিন্ধু সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা ধারণা করেন, ক্রমাগত বন্যার আঘাতে আঘাতে সিন্ধুর তীরে গড়ে ওঠা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরী মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। দ্রাবিড়ভাষী মানুষ সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। দ্রাবিড়ভাষী লোকদের সৃষ্ট নগর সভ্যতার স্পর্শ বাংলাদেশে লাগেনি। নিহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, ".... সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালীর ইতিহাসে নগরের প্রাধান্য নাই বলিয়াই চলে। উত্তর ভারতে রাজগৃহ, পাটনীপুত্র, সাকেত, শ্রাবস্তী, হস্তিনাপুর, পুরুষপুর, শাকল, অহিচ্ছত্র, কাণ্যকুব্জ, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কৌশম্বী প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য বাণিজ্যের বন্দর, পুর, নগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, বাংলাদেশে বাঙলার ইতিহাসে নগর নগরী সে স্থান অধিকার করিয়া নাই। বস্তুত বাংলাদেশে নগরের সংখ্যা কম এবং বাঙালীর সমাজবিন্যাসে নগরের প্রাধান্যও কম।" এদেশের উর্বর জমি ও সুপেয় পানিই বাঙালিকে গ্রামভিত্তিক সভ্যতায় অভ্যস্ত করেছে। লাঙলভিত্তিক কৃষি সভ্যতা বাঙালির বড় সৃষ্টি। এদেশের মানুষ কৃষিকাজকে সম্বল করেই সুখী-সমৃদ্ধ সংসার গড়ে তুলেছে।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করেছে মাটির পাত্র। এসব মাটির পাত্র একই গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের নয়। অঞ্চলভেদে গড়নের পৃথক ধরণ রয়েছে। বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রমাণ হিসাবে পোড়ামাটির জিনিসপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত।

আবহমানকাল ধরেই বাংলার মানুষ নদী কেন্দ্রিক জীবনধারা গড়ে তুলেছে। নদীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শহর, বন্দর, গ্রাম, জনপদ ও হাট-বাজার। আর নদীর দুই তীরের গ্রাম ও জনবসতিতে গড়ে উঠেছে কামার-কুমোরদের ঘর-বাড়ি। তারা নির্মাণ করেছে নিত্য ব্যবহার্য হাঁড়ি-পাতিল, পূজার জন্য মূর্তি, খেলনা পুতুল, হাতি, ঘোড়া, পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি। বাংলাদেশের বৈরী প্রকৃতির কারণে পোড়ামাটির প্রাচীনতম ফলকগুলো ধ্বংস হয়েছে এবং নদীর প্রবাহের সঙ্গে ভেসে গিয়েছে।

অষ্টম শতকের আগের পোড়ামাটির ফলকের প্রমাণ পাওয়া যায়নি বাংলাদেশে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত বরেন্দ্র ও সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধ মন্দিরের স্থাপত্যে পাওয়া গিয়েছে মাটির

ফলক। শিল্পীরা ফলকগুলোতে এঁকেছেন পশু-পাখি, নর-নারীর প্রেমের দৃশ্য ও দেবদেবীর চিত্র। মৃৎশিল্পীরা মাটির ফলকে বিচিত্র রকমের লোকজ মোটিফ ব্যবহার করে নিজেদের সৃজনশীলতাকে তুলে ধরেছেন। মাটির তৈরি পাত্রেও রয়েছে এদেশের গণমানুষের আচার, ধর্ম, সংস্কার ও ধর্মীয় অনুভূতির পরিচয়। মাটির পাত্র অলঙ্করণ এদেশের লোকসংস্কৃতিরই অংশ।

এদেশের সকল অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরাই পুতুল তৈরি করে আঙুল আর কাঠি দিয়ে। মহিলা ও শিশুরা আঙুল ও কাঠি দিয়ে টিপে টিপে এসব পুতুল তৈরি করে। এজন্য এগুলোকে টেপা পুতুল বলে। এসব পুতুল খেলনা হিসাবে তৈরি করা হয়। গ্রামের মানুষ বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রের সঙ্গে এসব পুতুল কিনে নেয়। শিশুরা পুতুলগুলো খেলনা হিসাবে ব্যবহার করে। প্রয়োজন আর আনন্দের মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষ তাদের সময় কাটায়। তাই তারা উৎসবের সময় শিশুদের খেলনার কথাও ভোলে না। চর্যাগীতি, রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে মৃৎফলকের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালে সাধারণ গৃহস্থরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা মাটির ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থানে অসংখ্য মাটির পাত্রের টুকরো পাওয়া গিয়েছে। নিহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলক এবং নানা প্রস্তর ফলকে মাটির খেলনা, ফুলদানি, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজনপত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকী, পুস্তকাধার প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এসব তৈজসপত্রের বহুল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই।"

প্রাচীন যুগ থেকেই মাটির তৈজসপত্র বাংলার মানুষের সাধারণ ব্যবহার্যে পরিণত হয়েছে। এসব তৈজসপত্র উৎপাদনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কুমার সম্প্রদায়। তারা নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য হাটে-বাজারে বিক্রয় করত। যন্ত্রশিল্পের বিকাশের সঙ্গে মাটির তৈজসপত্রের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। কুমার সম্প্রদায়ের পেশা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। তাদের পেশা অলাভজনক হওয়ায় তারা অন্য পেশা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত অলঙ্কার তৈরির উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ফুল, ফল, ফলের বীজ, জীবজন্তুর হাড়, শঙ্খ, ঝিনুক, কড়ি, নুড়ি, পাথর, কাঁচ, তামা, কাঁসা, পিতল, রূপা, সোনা, কাঠ, মনি-মুক্তা ইত্যাদি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হাতির দাঁতের অলঙ্কার ছিল খুবই মূল্যবান।

আদিম কালে অরণ্যচারী কিংবা গৃহবাসী মানুষ নিজেদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য ব্যবহার করত বিশেষ চিহ্ন। চিহ্নগুলো ছিল রঙের প্রলেপ। কিন্তু

নানা কারণে চিহ্নগুলো সহজে মুছে যেত। এ কারণে মানুষ নাক কিংবা কান ছিদ্র করে স্থায়ী চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করত অলঙ্কার। এভাবেই আত্মপরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে মানুষের মনে জন্ম নিয়েছে এক ধরনের সৌন্দর্য চেতনা।

প্রাচীন কালে মানুষের মধ্যে ধারণা ছিল শত্রু হত্যা করে তার হাড় কিংবা মুণ্ডু ব্যবহার করলে শত্রুর শক্তি বিনাশ হয়। এ বিশ্বাস থেকেই তারা বিভিন্ন জীবজন্তুর হাড়ের অলঙ্কার ব্যবহার করত। এখনো বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে দেহে লোহার মাদুলী ধারণ করলে মৌমাছি ক্ষতি করে না। সর্পমুখী বালা পরলে সাপের ভয় থাকে না। আদিম কালে বাঘ, সাপ ও কুমীরের ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ ব্যবহার করত বাঘের দাঁত, কুমীরের হাড় কিংবা সাপের হাড়ে তৈরি মালা। এভাবেই মানুষের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও ভয়-ভীতি থেকে লোক-অলঙ্কারের উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে তা সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাচীন কালেও মানুষের মধ্যে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার অদম্য আগ্রহ ছিল। এই প্রবৃত্তি তার সহজাত। সে নিজেকে সাজানোর জন্য ব্যবহার করেছে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ পরিধান করত মাটি, পাথর, হাড়, ঝিনুক ও ফুলের অলঙ্কার। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের সময় পাথর ও মাটির মূর্তির গায়ে অলঙ্কারের খোদিত চিত্র পাওয়া গিয়েছে। মহাস্থান, ময়নামতি ও পাহাড়পুর খননকালে পাওয়া গিয়েছে ধাতুর অলঙ্কার তৈরির ছাঁচ। প্রাচীন কালে বিচিত্র ধরনের অলঙ্কারের মধ্যে কানের ভূষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে কানফুল, কানপাশা, ঝুমকা, বালী, মাকড়ি, দুল, কানবালা ইত্যাদি। নাকের অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বেশর, নোলক, নাকফুল, নাকবালী, নাকমাছি, নাকটাকা, বলাক, চমকবালি ইত্যাদি। প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত গলার হারের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রহার, সাতনরী, শঙ্খমালা, গজমতি, মাদুলী, ধান-তাবিজ, ধনাহার, গজহার ইত্যাদি। মহিলারা হাতের অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করত বাজু, কাঁটাবাজু, শঙ্খবাজু, মনতাসা, বাউচি, তাগা, তাড় , অনন্ত, তারবালা, কাঁকন, বালা, চুড়ি, মকরমুখী, সাপমুখী, বয়লা, বার্তেনা, রুলি ইত্যাদি।

মহিলারা কোমর ও পায়ে অলঙ্কার ব্যবহার করত। কোমরের অলঙ্কারের মধ্যে ছিল বিছা, কাঞ্চীমালা, গুট, কাঞ্চী, মাঞ্চাভরণ, কাডাবিছা ইত্যাদি। পায়ের অলঙ্কারের মধ্যে ছিল নুপূর, মল, ঘুঙুর, বাঁকমল, আঙ্গুটি ইত্যাদি। শিরোভূষণ হিসাবে ব্যবহৃত হতো ছিকল, চন্দ্রচূড়, শঙ্খচূড়, টিকলি, টায়রা,

চন্দ্রফুল, খোপহার, খোপাকাটা, শিরোবন্দী, খোপাফুল ইত্যাদি। এসব অলঙ্কারের মধ্যে ছিল বিচিত্র ধরনের কারুকাজ-ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদির নকশা। কারুশিল্পীরা অলঙ্কার তৈরির জন্য ব্যবহার করেছে সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা, ব্রোঞ্জ, হাড়, মাটি, হাতির দাঁত, পাথর, মুক্তা, হীরা, কাঠ, ফলের বিচি ইত্যাদি। আধুনিককালেও অলঙ্কারের ব্যবহার বিলুপ্ত হয়নি। বরং কালের প্রবাহে এসব অলঙ্কারের ডিজাইন ও কারুকাজে পরিবর্তন এসেছে।

স্বর্ণের সঙ্গে নতুন পাথর যুগের মানুষের পরিচয় ছিল। এ থেকে বোঝা যায়, ধাতুর মধ্যে স্বর্ণের ব্যবহার প্রাচীনতম। তামার ব্যবহার স্বর্ণের আগে, না পড়ে, তা নিশ্চিত রূপে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে মানুষ নতুন পাথর যুগেই তামার নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায় তাম্র নির্মিত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়েছে। তামার পরই আবিষ্কৃত হয়েছে ব্রোঞ্জ ও পিতলের ব্যবহার। তামা ও দস্তার মিশ্রণে পিতল তৈরি হয়। উভয় ধাতুই তামা অপেক্ষা অনেক কঠিন এবং গলনাঙ্ক কম। পাথরের অস্ত্র অপেক্ষা তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র অনেক উন্নত ছিল। পাথরের প্রধান দোষ এর তীক্ষ্ণতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পাথরের অস্ত্র বার বার অকেজো হয়ে পড়ে।

মানুষ ধাতুর ব্যবহার শেখার পর তার অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা বেড়ে যায়। কিন্তু ধাতুবিদ্যার কাজ বেশ জটিল। তা একজনের কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন বহু কারিগর। এ কারণেই ব্রোঞ্জ ও তামার যুগে বিশেষ ধরনের শ্রমের সৃষ্টি হয়। মানুষ একটি যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর মাধ্যমে তারা ধাতু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে। ঐতিহাসিক কাল আবির্ভাবের দেড় থেকে দুই হাজার বছর পরে লৌহ যুগের আবির্ভাব হয়েছে। মিশর ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের আদিম অধিবাসীরা প্রস্তর যুগ থেকে সরাসরি লৌহ যুগে প্রবেশ করেছে।

প্রাচীন কালেও মানুষ কাঠের কারুপণ্য ব্যবহার করত। কিন্তু এসব শিল্পকর্ম কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। নদীর ভাঙন এবং আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে কাঠে নির্মিত বিভিন্ন কারুপণ্য বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে সূত্রধরের পরিচয় পাওয়া যায়। সূত্রধর শুধু কাঠ-মিস্ত্রী নয়, প্রাচীন শাস্ত্রে সূত্রধর বলতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর ও কাঠ-মিস্ত্রীসহ সকলকেই বুঝানো হতো।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই চাকার ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু এর তেমন কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিল্পীরা বিভিন্ন শিল্পকর্মে যে চাকা এঁকেছেন, তা থেকেই চাকার আদি ইতিহাস জানা যায়। ৩৫০০

খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুমেরীয় সভ্যতার চাকার গাড়ির চিত্রে চাকার নমুনা পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার শুরু থেকেই চাকার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

চাকা আবিষ্কারের আগে একটি মাঝারি আকারের মৃৎপাত্র তৈরি করতে কুম্ভকারের সময় লাগত কয়েকদিন। চাকা আবিষ্কারের পর থেকে একজন কুম্ভকার কয়েক মিনিটে একটি মৃৎপাত্র আবিষ্কারের ক্ষমতা অর্জন করে।

চাকার ব্যবহার শুরু হবার পর মৃৎশিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। গাড়ির সঙ্গে চাকা সংযোজনের জন্য মানুষকে শত শত বছর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছে। এরপর মানুষ চাকার গাড়ি নির্মাণে সফল হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সভ্যতায় কাঠে নির্মিত চাকার গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। মানুষ যত অগ্রসর হয়েছে ততই চাকার গুরুত্ব বেড়েছে। প্রথম দিকে টুকরো কাঠকে তামার পেরেকের সাহায্যে জোড়া লাগিয়ে এক প্রকার চামড়ার বেষ্টনী দিয়ে বেঁধে চাকা নির্মাণ করা হতো। চাকা আবিষ্কারে দারুশিল্পীদের অপরিসীম অবদান রয়েছে।

কাঠে নির্মিত ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও কিছু কিছু কাঠের স্তম্ভ, খিলান ও খুঁটির নমুনা টিকে রয়েছে। আনুমানিক দশম শতাব্দী কিংবা তার পরবর্তী সময়ে কাঠশিল্পের দুটি স্তম্ভের চমৎকার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বিক্রমপুর অঞ্চলের সোনারং গ্রামের একটি পুকুরে। আরেকটি নিদর্শন তীর্থঙ্করের কাঠের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে ফরিদপুরে। প্রাচীনকালে আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, গরুর গাড়ি, রথ, নৌকা কিংবা বৃহদাকৃতির জাহাজ কাঠে নির্মিত হতো। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে সব সময়ই পাথরের অভাব ছিল। তাই সূত্রধররা পাথরের পরিবর্তে ব্যবহার করেছে কাঠ ও মাটি। এদেশে যেমন মাটি দিয়ে হাতি, ঘোড়া ও পুতুল নির্মিত হয়েছে, তেমনি এসব পণ্য নির্মাণ করতে কাঠও ব্যবহৃত হয়েছে।

মধ্যযুগে সোনারগাঁয়ের চিত্রিত ঘোড়া ও হাতি খুবই বিখ্যাত ছিল। এর খ্যাতি ছিল সারা ভারতবর্ষে। শুধু নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য হিসেবে নয়, শিল্পকর্ম হিসেবে সূত্রধরদের কাজ অপূর্ব মহিমা মণ্ডিত ছিল। সূত্রধররা কাঠখোদাই কাজের মাধ্যমে তুলে ধরেছে পৌরাণিক গল্প, শিকারের শিকারীর অভিনয় কিংবা হাতির লড়াইয়ের দৃশ্য।

প্রাচীনকালে মুদ্রণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হতো কাঠের ব্লক কিংবা সীল। বেইজিং জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে কাঠে খোদাই করা প্রাচীন লিপি। ৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কাঠ খোদাই করা ব্লকে মুদ্রিত একটি চীনা পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ জাদুঘরে রাখা রয়েছে। ঋকবেদে সূত্রধরদের কথা উল্লেখ রয়েছে। সে সময় সমাজে

তাদের অবস্থান ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সম্রাট অশোক কাঠমিস্ত্রীদের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তখন রাজকীয় কারিগরদের আহত করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কারুশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

বৈদিক যুগে ঋষিরা নিজেরাই কাঠের উৎসর্গ স্তম্ভ ও বেদি তৈরি করতেন। রাজ সিংহাসন নির্মিত হতো কাঠে। এসব সিংহাসনে সিংহ, বাঘ, ময়ূর, পদ্ম ইত্যাদির চিত্র অঙ্কিত থাকত। সিংহ অঙ্কিত আসনকেই সিংহাসন হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। ময়ূর অঙ্কিত আসনকে বলা হতো ময়ূর সিংহাসন। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে দারুশিল্প।

মানুষ যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করেছে সূত্রধরদের দ্বারা নির্মিত কারুকার্য খচিত দরজা, জানালা, চৌকাঠ, খাট, পালঙ্ক, পিঁড়ি, অলংকার ইত্যাদি। সূত্রধররা তাদের কাজে নিজেদের দক্ষতার পাশাপাশি সহজাত সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। আধুনিককালেও কাঠখোদাই চিত্রের মর্যাদা হ্রাস পায়নি। প্রাচীনকালে কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে লাঙল, জোয়াল ও আখমাড়াই যন্ত্র ইত্যাদি।

কাঠের তৈরি গৃহস্থ সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে লাঙল, জোয়াল, ঢেকি ও কাহাইল। গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে রয়েছে কাঠের চামচ, বাসন, বাক্স, সিন্ধুক, জলচৌকি, প্রদীপদানি, ফুলদানি ইত্যাদি। বাসস্থানের জন্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে রয়েছে অলঙ্কৃত খুটি, চৌকাঠ, দরজা, বেড়া, জানালা ইত্যাদি। যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত কাঠের দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে নৌকা, গরুর গাড়ি, চাকা ও পালকি। শুধু জীবনের প্রয়োজনে নয়, বিনোদনের উপাদান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে কাঠের যন্ত্র। অবসর সময়কে আনন্দময় করে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয় যন্ত্র সংগীত। শিশুদের আনন্দ দানের জন্য নির্মিত হয় কাঠের হাতি, ঘোড়া, পুতুল ও দোলনা। এভাবেই কাঠশিল্প আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। আসবাবপত্র ছাড়াও জীবনের প্রয়োজনেই নির্মাণ করা হয়েছে কাঠের সেতু। নাগরিক জীবনেও কাঠের খাট, পালঙ্ক ও আলনার চাহিদা এখনো হ্রাস পায়নি। এক সময় বাংলাদেশে আম, কাঁঠাল, শিমুল, ছাতিম, নিম, কড়ই, জাম, শাল, সেগুন, চাপালিশ, তুলা, কদম ইত্যাদি গাছের কাঠ ছিল সহজলভ্য। সাধারণ মানুষের ঘরের কাছেই পাওয়া যেত উন্নত মানের কাঠের গাছ, আম, জাম আর কাঁঠাল। দ্রুত নগরায়নের প্রয়োজনে বয়স্ক গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। ফলে কাঠশিল্পীদের পেশা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কাঠের তৈরি পালকি বাহন হিসাবে লোকযানগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন কালে পালকিতে চড়তেন রাজরাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর

মানুষ। যারা কাঁধে করে পালকি বহন করে নিয়ে যেতেন, তাদেরকে বলা হতো বেহারা কিংবা কাহার। বেহারারা ছিলেন নিচু তলার খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের জীবিকার প্রধান উৎস ছিল পালকি বহন করা। পালকি বহন করার কাজটি ছিল খুবই কঠিন। তাই বেহারারা গান গাইতে গাইতে ছন্দের তালে তালে দৌড়াতেন। এভাবেই ভুলে থাকতেন কঠোর পরিশ্রমের কথা। পালকি বহনকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে অসংখ্য পালকির গান। প্রাচীন ভারতে রাজরাজারা এক ধরনের মনুষ্যবাহিত যানে চলতেন। তার নাম ছিল 'শিবিকা'। শিবিকার অর্থ হচ্ছে পালকি। পাল আমলে বাংলাদেশে পালকির প্রচলন ছিল।

মধ্যযুগে মুঘল বাদশা এবং পাঠান সুলতানরা একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন পালকি দিয়ে। সড়ক পথে যান্ত্রিক যান চালু হবার আগে যান হিসাবে পালকি স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে বর-কনেকে বহন করার জন্য ব্যবহার করা হতো পালকি। অভিজাত মহিলারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে ব্যবহার করতেন পালকি। জমিদাররা দূরের কাচারিতে যেতেন পালকিতে চড়ে।

অভিজাত মহলের যান বলে সূত্রধরা অত্যন্ত নিপুণ হাতে পালকি নির্মাণ করতেন। এর গায়ে আঁকা থাকত বিচিত্র রকমের কারুকাজ। তারা পালকির গায়ে খোদাই করত বিচিত্র রকমের লতা-পাতা, ফুল, গাছ, পেখম খোলা ময়ূর কিংবা জোড়া হাঁসের ছবি। আগে প্রায় প্রতিটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পালকি ব্যবহৃত হতো। যান্ত্রিক যানবাহন চালু হবার পর পালকির চল প্রায় উঠে গিয়েছে। ফলে বেহারাদের পেশা অবলুপ্ত হয়েছে।

মানুষ পুরোনো পাথর যুগ থেকে চামড়া শুকিয়ে পোশাক হিসাবে ব্যবহার করেছে। চামড়ার দড়ি বানিয়েছে। এর সাহায্যে মাদুর বুনেছে। কৃষিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তিসি ও তুলার চাষ করেছে। তা থেকে বস্ত্র বয়ন করেছে। ভেড়া পালন শেখার পর বস্ত্র বোনার জন্য লোম ব্যবহার করেছে। নতুন পাথর যুগে মিশর ও সুইজারল্যান্ডে তিসির কাপড় বুনার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আনুমানিক ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিন্ধু উপত্যকায় তুলার চাষ হয়েছে এবং তা থেকে বস্ত্র বয়ন করা হয়েছে। এসব বস্ত্র ব্যবহারের জন্য তাঁতযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে কিনা-তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীদের অনুমান সে সময় তাঁতযন্ত্র প্রস্তুত হয়েছে; কিন্তু তা কাঠ দ্বারা নির্মিত হওয়ায় কালের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

খ্রিস্টের জন্মের আগেই দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার প্রমাণ রয়েছে কৌটিলের অর্থশাস্ত্রে, আরব, চীন ও ইতালির

পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের ভ্রমণ কাহিনীতে। নিহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, প্রাচীনকালে বঙ্গ ও পুণ্ড্রে চার প্রকার বস্ত্র রয়েছে। চার প্রকার বস্ত্রের মধ্যে রয়েছে দুকুল, পাত্রার্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক। মধ্যযুগে বাংলাদেশে উৎপাদিত মসলিনের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। মসলিন ছিল মুগল রাজ দরবারের ফ্যাশন। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে মসলিন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের ফ্যাশন হিসাবে টিকে রয়েছে জামদানি শাড়ি।

ফারসি শব্দ 'জামদানি'। এর মানে বুটিদার কাপড়। জামদানির নকশাগুলোতে ইরানের লোকজ সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। সিভিল সার্জন জেমস টেলর তার 'টপোগ্রাফি অফ ঢাকা' গ্রন্থে লিখেছেন 'সম্ভবত মুসলমানরাই জামদানির বুনন প্রচলন করেন এবং তাদের হাতেই এ শিল্পটি একচেটিয়াভাবে সীমাবদ্ধ আছে।'

জামদানির নকশাগুলো পরিচিত পরিবেশ থেকে নেয়া হয়েছে। জামদানি শিল্পীর শিল্প চিন্তায় ফুটে উঠেছে তারা আর ফুলের রূপকল্প। এসব মোটিভ জ্যামিতিক রেখায় রূপান্তরিত হয়ে একটি রীতিবদ্ধ নকশার রূপ ধারণ করেছে। জামদানি শাড়ির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সংযত রঙের ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্ন অলঙ্করণ।

সম্রাট আওরঙ্গজেব জামদানির বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তার জন্য তৈরি প্রতিটি জামদানির মূল্য ছিল একত্রিশ পাউন্ড। বছরের পর বছর ধরে মুগল সম্রাটরা জামদানির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঢাকার সরকারি আড়ং বা কারখানায় এগুলো তৈরি হতো। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংরেজরাও বিলেতে জামদানি রফতানি করত। তারা এর উৎকৃষ্ট মানের প্রতিযোগিতায় শঙ্কিত হয়ে ১৭০০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এদেশের কাপড় রফতানি নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাস করে। এর ফলে জামদানি শিল্পটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮১৬ সালে ঢাকা আড়ং-এর শিল্পীরা বোর্ড অব ট্রেডকে উদ্দেশ্য করে নিজেদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে লেখেন 'আমাদের পূর্বপুরুষ এবং আমাদেরপরিবারের পাঁচশত কর্মজীবী জামদানি রফতানি থেকে প্রাপ্ত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু গত বছর আমরা জামদানি রফতানির কোনো অর্ডার পাইনি। আমাদের জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় নেই এবং আমরা অন্য কোনো পেশার সন্ধান পাইনি।' এ থেকেই বোঝা যায় ইংল্যান্ডে জামদানি রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জামদানি শিল্পীদের জীবনে কতটা দুর্বিষহ দুঃখ-কষ্ট নেমে এসেছিল।

১৮২৪ সালে ঢাকায় প্রথমবারের মতো বিলেতী সুতো আমদানি করা হয়। কলের তৈরি সস্তা সুতোর কাছে হাতের তৈরি সূক্ষ্ম সুতো মার খায়। হাতে কাটা সুতো বন্ধ হয়ে গেলে তাঁতীরা কলের তৈরি মোটা সুতো দিয়ে জামদানি তৈরি শুরু করে। এতে জামদানির সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে যায়। হারানো দিনের সেই জামদানি সংরক্ষিত আছে ঢাকা জাতীয় জাদুঘর, বিলেতে ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড এলবার্ট মিউজিয়াম, ভারতের কেলিকো মিউজিয়াম অফ টেক্সটাইল ও কলকাতা জাদুঘরে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে সংরক্ষিত আছে নানা রঙ আর বৈচিত্র্যপূর্ণ জামদানি। জামদানির প্রাচীন ঐতিহ্য টিকে আছে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও নোয়াপাড়ায়। সে সব এলাকায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে অত্যন্ত উন্নত মানের তুলো উৎপাদিত হতো। কিন্তু এখন সেখানে উন্নত মানের তুলো উৎপাদিত হয় না। বর্তমানে আমদানি করা বিদেশী সুতো দিয়ে বোনা হয় জামদানি। ড. দীনেশচন্দ্র সেন যেসব জামদানির নাম উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পান্না হাজার, তোড়াদার, কারেলা, মেল, দুবলীজাল বুটিদার, তেরছা, জালার ছাওয়াল, বালআর, ডবিয়া, গেদা, সাবুর গা প্রভৃতি।

জামদানির নকশা হিসাবে ব্যবহৃত মোটিফকে বলা হয় 'বুটা'। জামদানির জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বোনা হয় বিভিন্ন ধরনের 'বুটা' বা নকশা। পরিচিত 'বুটা'গুলোর মধ্যে রয়েছে আশরাফী ফুল, গিলাফুল, গাদা ফুল, এরোপ্লেন, পাইন্নাফুল, জুঁইফুল, তারাফুল, খিরাই বিচি, পোনা বুটা, ডালিম, শাপলা, করলা, কুকিস, করাত, ডালি মুকুল, আনারস ফুল, কলসফুল, চিড়াফুল, পাঁপড়ি, বাঘের পাড়, চিনির বাসন, বেলপাতা, শঙ্খ, পান ইত্যাদি। মুসলমান তাঁতীরা জামদানি তৈরি করে বলে এতে লতাপাতা ফুলের ছবিই থাকে বেশি। দেবদেবীর ছবি থাকে না।

জামদানির জনপ্রিয়তা হিন্দু পরিবারের চেয়ে মুসলমান পরিবারেই বেশি। তবে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলারা ফ্যাশন হিসাবে জামদানি ব্যবহার করে। জটিল কারুকাজের জন্য জামদানি সবচেয়ে দামী বস্ত্র। মুর্শিদাবাদের নবাবরা জামদানির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নবাব জাফর আলী খান বাদশাহ আওরঙ্গজেবের জন্য যে সব উপহার পাঠাতেন, সেগুলোর মধ্যে জামদানিও ছিল। অবনতির শেষ স্তরে এসেও জামদানির কদর অবলুপ্ত হয়নি। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের জন্য দুইশত টাকা মূল্যের কয়েকটি জামদানি তৈরি হয়। ১৯০৩ সালে নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীতে জামদানি প্রথম পুরস্কার পায়। পুরস্কারপ্রাপ্ত শাড়িটির দাম ছিল ৫০০ টাকা।

জামদানি সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য শাড়ি নয়। ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা শখে কিংবা ফ্যাশন হিসাবে জামদানি ব্যবহার করে। তাই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে জামদানি বেঁচে আছে। তাঁতীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার কয়েকটি গ্রামে এখনো জামদানি বয়ন অব্যাহত রয়েছে।

রেশমের উৎপত্তি স্থল চীনে। চীনের প্রাচীন সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে রেশমের উন্নত কাপড়। পরবর্তী সময়ে চীনেই রেশম শিল্পের প্রসার ঘটে। ২৬৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনা সম্রাট হুয়াং তি-র সময়ে তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় রেশম বস্ত্র চীনের রুচি, ফ্যাশন ও আভিজাত্যে পরিণত হয়।

চীনারা গুটিপোকা থেকে রেশম উৎপাদনের পদ্ধতি বহুকাল পর্যন্ত গোপন রাখতে সক্ষম হয়। তারা বিদেশে রেশম রফতানি করে নিজেদের অর্থনীতিতে গতি সৃষ্টি করে। যাতে রেশম উৎপাদনের প্রক্রিয়া গোপন থাকে, সে জন্য চীনের সরকার কঠোর আইন করে। এ আইনে রেশম উৎপাদনের গোপনীয়তা ফাঁস করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

৩০০ খ্রিস্টাব্দে জাপানিরা রেশম উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করে। ভারতবর্ষে রেশম উৎপাদন সম্পর্কে পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে যে, ১৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জনৈক চীনা রাজকুমারী বিয়ের জন্য ভারতে আসার সময় সে তার মুকুটের মধ্যে লুকিয়ে চীন থেকে ভারতে রেশম বস্ত্র নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদীর অববাহিতকায় রেশম চাষের প্রসার ঘটে। বাংলাদেশের রেশম চাষের শুরু সেখান থেকেই।

তুঁত গাছের পাতা খেয়ে বেড়ে ওঠা পোকাকে গুটিতে পরিণত করার প্রক্রিয়াটি কৃষি কাজেরই অংশ। কিন্তু রেশমের সুতো আহরণের কাজটি একটি সম্পূর্ণ কারুশিল্প। রেশমসুতো থেকে বস্ত্র উৎপাদনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে-

প্রথমত তাঁত।

দ্বিতীয়ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বস্ত্র উৎপাদন।

একসময় রেশম বস্ত্র বুননে তাঁতের প্রচলন ছিল অধিক। এরপর ধীরে ধীরে যন্ত্র তাঁতের স্থান দখল করে নেয়। ছাপা ও রঙ করার কাজটি অযান্ত্রিক ও যান্ত্রিক উভয় পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়।

এদেশের মসলিন ও জামদানির মতো রেশম বস্ত্রও একটি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প। মসলিন বিলুপ্ত হয়েছে। জামদানির উৎপাদন সীমিত হয়ে পড়েছে ঢাকা জেলার কয়েকটি এলাকায়। রেশম বস্ত্র স্বমহিমায় টিকে রয়েছে। এর কারণ, রেশম বস্ত্রের বহুমুখী ব্যবহার। শুধু শাড়ি হিসাবেই নয়, বিভিন্ন

পোশাক-আশাক তৈরিতে রেশম বস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেলোয়ার-কামিজ ও শার্ট থেকে শুরু করে বরের মাথার পাগড়ি পর্যন্ত তৈরি হয় রেশম বস্ত্র দিয়ে। বর্তমানে রেশম বস্ত্রের নকশা তৈরিতে লোকজ মোটিফের পরিবর্তে আধুনিক ডিজাইন প্রবলতর হয়ে উঠেছে। ফলে লোকজ ধারার রেশম বস্ত্রের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে আধুনিক ধারার রেশম বস্ত্র প্রধান হয়ে উঠেছে।

এদেশের মানুষের মধ্যে সব সময়ই বিজ্ঞান চেতনার অভাব ছিল। বাংলাদেশে মিশরীয় সভ্যতার মতো নির্মাণ শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে কৃষিক্ষেত্রে বাঙালিরা উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছে। এ কারণেই তাদের পক্ষে উন্নত কৃষি সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

শস্য উৎপাদনের মধ্যে উন্নত মানব সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে। মানুষ আদিকালে ছিল পশু শিকারী। এরপর তারা ক্রমশ পরিকল্পিত উপায়ে শস্য উৎপাদনের জ্ঞান অর্জন করেছে এবং পশুকে ক্রমশ গৃহপালিত করেছে। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। একইভাবে মানুষ পেশীশক্তির ব্যবহার হ্রাস করে পশুশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবগোষ্ঠির মধ্যে পার্থক্যের কারণ জমির উর্বরতা, আয়তন এবং আর্দ্রতা। নিহাররঞ্জন রায় প্রমাণ করেছেন, বাঙালির জনসৌধের মূল ধারাটি হচ্ছে আদি-অস্ট্রেলীয়। তারাই এদেশে কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার সূচনা করেছে। 'লাঙল' শব্দটি অস্টিকভাষীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ শব্দের মূল অর্থ 'চাষ করা' এবং 'চাষ করার যন্ত্র'। খুব প্রাচীনকালে আর্যভাষীরা 'লাঙল' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। তখন তারা চাষকার্য জানত না। চাষযন্ত্রের সঙ্গেও তাদের পরিচয় ছিল না। অস্ট্রিকভাষী লোকরা সমতল ভূমি ও পাহাড় কেটে বন্য ধানের চাষ আয়ত্ত্ব করেছে। তারা ধান ছাড়াও কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান, নারকেল, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, ডালিম ইত্যাদি চাষ করেছে। এসব শব্দ বাংলাদেশ গৃহীত হয়েছে অস্ট্রিক ভাষা থেকে। কার্পাস শব্দটিতও অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে। এ থেকেই স্পষ্ট যে বাঙালিরা আদিকাল থেকেই চাষকার্যে দক্ষ ছিল। কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন বাংলার গৃহশিল্প। আদি-অস্ট্রেলীয়রা একাধিক জীবনে বিশ্বাস করত। তাদের ধারণা ছিল কারো মৃত্যু হলে তার আত্মা কোনো পাহাড়, গাছ কিংবা পাখিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। পরবর্তীকালে তাদের এ ধারণা থেকেই জন্ম হয় পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদের দর্শন।

বঙ্গ-সংস্কৃতিতে খাদ্য হিসাবে রয়েছে বিচিত্র রকমের মিষ্টি ও পিঠা। মিষ্টি হচ্ছে বাঙালির উৎসবের খাবার। উৎসবে-পার্বণে, ঈদে- মিলাদে এবং

বর্ষবিদায়ে ও নববর্ষকে বরণ করে নেয়ার জন্য মিষ্টিমুখ করানো এদেশের গণমানুষের সংস্কৃতির একটি প্রেরণাদায়ক অংশ। একসময় নববর্ষে দোকানে-দোকানে হালখাতা খুলে মিষ্টিমুখ করানো হতো। মিষ্টির মতোই বাঙালির খাবার তালিকায় রয়েছে পিঠার প্রাধান্য। নবান্নে ঘরে ঘরে বসে পিঠার উৎসব। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পিঠা তৈরির মধ্যেও রয়েছে শিল্প-চেতনা।

গ্রামের মানুষ নিজেদের আশে-পাশে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নানা রকম নকশি পিঠা। পিঠা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় চাল, গুড়, নারকেল, দুধ ইত্যাদি। এগুলো গৃহস্থ্যের বাড়িতেই পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের মাটির ছাঁচে পিঠা তৈরি করা হয়। এসব ছাঁচের নকশা হয়ে থাকে বিচিত্র রকমের। যেমন-জ্যামিতিক, বর্গাকার, ত্রিকোণ, বৃত্ত কিংবা অর্ধচন্দ্র আকারের। আবার কোনোটির আকার হয় মাছ, লিচু, আনারস, আতা, ময়ূর কিংবা ঘোড়ার আকার। এসব পিঠার বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন-পাকোয়ান, পুলি, ফুল, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ভাপা, সরফুরিয়া ইত্যাদি। পিঠার গায়ে উৎকীর্ণ থাকে বিভিন্ন শুভেচ্ছা বাক্য। যেমন- 'সুখে থাকো' 'শুভেচ্ছা রইলো', 'শুভ বিবাহ' ইত্যাদি। এসব ক্ষণস্থায়ী বাক্য কিংবা শব্দের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাঙালির শুভ চিন্তার প্রতিফলন। খাবারের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের এই সংস্কৃতি বাংলাদেশের মানুষকে বিশেষভাবে মহিমামণ্ডিত করেছে।

বাংলাদেশের মানুষের গৃহস্থ সামগ্রীর মধ্যেও উন্নত রুচির প্রকাশ ঘটেছে। তারা ঢাকনা হিসাবে ব্যবহৃত সরায়ও এঁকে রাখে বিভিন্ন চিত্রমালা। হিন্দুরা পূজা-পার্বণে ব্যবহার করে সরাচিত্র। লক্ষ্মীপূজায় ব্যবহৃত সরাচিত্র মানুষের মনে এক বর্ণিল উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রেই সরায় ব্যবহৃত হয় দুর্গা, লক্ষ্মী কিংবা রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। প্রথমে সরার উপর দাগ টেনে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এরপর লক্ষ্মীর সরায় আঁকা হয় লক্ষ্মীর ছবির মাঝখানে আঁচলের নিচে প্যাঁচা ও ধানের শীষ। মুসলমান সমাজেও রয়েছে চিত্রিত সরার ব্যবহার। এসব সরায় আঁকা হয় ফুল ও লতা-পাতা। সরার নামও মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন-গাজীর সরা, মহররমের সরা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ মেলায় পাওয়া যায় ঘটচিত্র। বিচিত্র গড়ন ও রঙের কারণে ঘটচিত্রগুলো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিন্দুরা এসব ঘটচিত্র পূজা-পার্বণে ব্যবহার করে থাকে। পূজা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি আঁকা হয় এসব ঘটে। একই কারণে নামও বিভিন্ন। যেমন-অষ্টনাগ ঘট, মঙ্গল ঘট, মনসা ঘট, লক্ষ্মী ঘট, শীতলা ঘট ইত্যাদি।

একসময় সারা বাংলাদেশে চিত্রিত হাঁড়ির প্রচলন ছিল। রাজশাহী অঞ্চলের চিত্রিত হাঁড়ির নাম শখের হাঁড়ি। ঘটচিত্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিবিড় হলেও শখের হাঁড়ির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিবিড় নয়। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মিষ্টি কিংবা পিঠা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য শখের হাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। পল্লীগৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নক্‌শী শিকার শখের হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয়। মাটির হাঁড়ির উপর সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে আঁকা হয় মাছ, পাখি, লতা-পাতা কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর নক্‌শা। নক্‌শাগুলো আঁকার জন্য ব্যবহৃত হয় উজ্জ্বল সবুজ, লাল কিংবা নীল রঙ। কুমারের হাতের পরশে মূর্ত হয়ে ওঠে তার শিল্পী মনের ভাবনা।

আবহমান বাংলাদেশের নারীর কোমল মনের শিল্পীত প্রকাশ নকশীকাঁথা। প্রথমে শীত নিবারণের প্রয়োজনেই উদ্ভব ঘটেছে কাঁথার। পরবর্তীকালে উৎসব, ধর্মানুষ্ঠান, জন্ম, মৃত্যু ও কন্যার বিয়েতে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়েছে কাঁথা। এসব উৎসকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়েছে নকশীকাঁথার মোটিফ। প্রথমে কাঁথা ছিল কারুকাজহীন-সাদামাটা। ধীরে ধীরে তাতে চিত্রিত হয়েছে বৃক্ষ, হংস, চাঁদ, সূর্য, মাছ, হাতি, ঘোড়া, পাখি, চড়কাসহ বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালী বস্তু। এরপর এসেছে ধর্মের প্রভাব। অঙ্কিত হয়েছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি, কারবালার ময়দান কিংবা দুলদুল ঘোড়া।

শাড়ির পাড় থেকে নেয়া রঙিন সুতোয় বোনা হয়েছে আবহমান বাংলার নিসর্গ, চেনা ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা। একসময় গৃহস্থালীর গুণের সঙ্গে কাঁথা সেলাই কনের অন্যতম গুণ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। কবি চন্দ্রাবতী তার রামায়ণ কাব্যের সীতার অন্যান্য গুণের সঙ্গে কাঁথা সেলাইয়ের গুণের কথাও বর্ণনা করেছেন। পুরোনো কাপড়ে রঙিন সুতো, কাঠ-কয়লা, খড়িমাটি কিংবা কোনো গাছ থেকে সংগৃহীত রসে আঁকা হয় এসব বিচিত্র রকমের চিত্রমালা। এরপর সুঁই দিয়ে সেলাই করা হয় চিত্রগুলো। এসব ফুটে ওঠে মাতৃস্নেহের করুণ রস, একাকী প্রিয়ার মনের বেদনা, কুমারী মনের মধুর প্রেম কিংবা ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় বোনের শ্রদ্ধার কথা। মেয়েলী ছড়া ও গানে রয়েছে নক্‌শীকাঁথার বর্ণনা। অনেক সময় কাঁথার উপরে লেখে দেয়া হয় লোকজ কবিতার চিরায়ত বাণী। একটি লোকজ ছড়ায় আছে–

'সোনামণি ভাই আমার সুখে নিদ্রা যাইও।
অভাগিনী বুবুর কথা নিরলে ভাবিও॥'

এসব কথা পড়ে স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগে বুবু অভাগিনী কেন? সে কি বিধবা? বিরহী মনের এই চিরায়ত সুরে মানবিক আবেগেরই প্রকাশ ঘটেছে নকশীকাঁথায়।

নকশীকাঁথার মতো নকশী পাখাও আরেক আবেগময় সৃষ্টি। নকশীপাখা বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই জনপ্রিয়। গরমে যখন মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হয়, তখ নকশীপাখার কোমল বাতাস মানুষের দেহ ও মনে স্বস্তি এনে দেয়। গ্রামের নারীরাই নকশীপাখার স্রষ্টা। তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসরে নকশীপাখা তৈরি করে।

নকশী পাখা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় শন, বাঁশ, শোলা, কাপড়, তালপাতা, খেজুর পাতা ইত্যাদি। এসব উপকরণ সব বাড়িতেই কম-বেশি পাওয়া যায়। তাই নকশীপাখা তৈরিতে তেমন কোনো অর্থ খরচ হয় না।

দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি আঁকা হয় নকশীপাখায়। এসব পাখার আকার ও নকশার জন্য নামকরণও ভিন্ন হয়। বাঁশের পাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গোলপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, কাঁকরমালা ইত্যাদি। বেতের তৈরি পাখার মধ্যে রয়েছে পালঙ্কপোষ, পাশার দান। এসব নকশীপাখায় আঁকা হয় ফুল, লতাপাতা, মানুষ, পশু, পাখি, চাঁদ, তারা ইত্যাদি ছবি। অনেক সময় পাখার উপরে লেখা থাকে বিভিন্ন ধরনের ছড়া, নীতিকথা ও প্রবাদ বাক্য।

বাংলাদেশে নকশীপাটি খুব জনপ্রিয়। সাধারণ বিছানা হিসাবে পাটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জায়নামাজ, খাবারের আসন ও বরের আসন হিসাবে নক্‌শীপাটি ব্যবহৃত হয়। নকশী পাটিতে যে সমস্ত নক্‌শা বোনা হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মসজিদ, মিনার, পালকি, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি। সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালী শীতল পাটি তৈরির জন্য বিখ্যাত। নকশীকাঁথা, নকশীপাখা ও নকশীপাটি ব্যবহৃত হয় দৈনন্দিন কাজে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসব পণ্য উৎপাদনের মধ্যেও তুলে ধরেছে তাদের শিল্পী মনের কোমল পরশ।

মানুষ মাত্রেই উৎপাদক ও শিল্পী। তাই তার শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের গায়ে থাকে শিল্পী মনের পরশ। এভাবেই তাদের সৃজনশীলতায় লোক-সংস্কৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। অতি ব্যবহারে পণ্যের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টি নষ্ট হয় না। পুরোনো প্রজন্মের সৃষ্টি বয়ে নিয়ে যায় নতুন প্রজন্মের মানুষ। এভাবেই সময়ের করাল গ্রাসের পরও লোকজ সৃষ্টি টিকে থাকে।

বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতির একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে বাঁশ ও বেতের কাজ। প্রাচীন কালে বাঙালিরা তৈরি করেছে দোচালা ও চারচালা ঘর। এ ছাড়া তারা বাঁশ দিয়ে তৈরি করেছে মাথাল, নৌকার ছৈ, পাখির খাঁচা, মাছ ধরার ফাঁদ, ঝুড়ি, ডালা, চালনি, ধামা, লাঠি ইত্যাদি। বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি করেছে ধামা, ঘোড়া, চেয়ার, বাক্স, ছাতার বাট, সূক্ষ্ম জালির পর্দা, নকশি

আসন ইত্যাদি। বাঁশ ও বেতের জিনিস তৈরিতে কারুশিল্পীদের অসামান্য দক্ষমতার পরিচয় রয়েছে।

এদেশের মানুষ সব সময়ই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। আর্যরা ভারতে এসেছে নতুন এক ধরনের সংস্কৃতি নিয়ে। তারা সমগ্র উত্তর ভারত করায়ত্ত করেছে। এর ফলে সেখানে একটি নতুন ধরনের সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। কিন্তু বাঙালিরা আর্যদের আনুগত্যের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। এ জন্য তারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বলেছে পক্ষীভাষী কিংবা অসুর। আর্যরা অসুরদের কাছে পরাজিত হয়েছে। এ কারণেই এ অঞ্চলের মানুষের প্রতি আর্যদের ক্রুদ্ধবাণী উচ্চারিত হয়েছে বার বার।

বাংলা সনের ইতিহাস

বাংলা সন কোনো রাজা বা মহাপুরুষের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এদেশের ফসলের মৌসুমকে কেন্দ্র করে বঙ্গাব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। মুঘল সম্রাটদের রাজকার্য পরিচালনার জন্য তা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রচলন করেন। তার সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বেশ কয়েকটি সন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, লক্ষণ সন, বিক্রম সন ইত্যাদি। সনগুলো রাজকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে চালু করা হয়েছিল। এর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক ছিল খুবই সামান্য। প্রচলিত সনগুলোর মধ্যে কোনোটা সৌর রীতিতে, আবার কোনোটা চান্দ্র রীতিতে গণনা করা হতো। সনগুলোর মধ্যে ছিল দিনক্ষণের গরমিল। সাধারণ মানুষের কাছে দিন ও বছরের হিসাব করে কাজ সম্পন্ন করার বিষয়টি হয়ে উঠেছিল জটিল ও দুরূহ।

সম্রাট আকবর প্রধানত দু'টি কারণে সন পুনর্বিনস্ত করার কথা ভেবেছিলেন। প্রথমত তার আমলে বেশির ভাগ সন গণনা করা হতো চান্দ্র রীতিতে। ভারতীয় গণনা অনুসারে বারোচান্দ্র মাসে ধরা হতো ৩৬০ তিথি। অর্থাৎ সৌর সনের চেয়ে এক চান্দ্র বছরে দিনের সংখ্যা কম ছিল। এই গরমিল দূর করতে জ্যোতিষীরা তিন বছর অন্তর অন্তর অতিরিক্ত এক মাস যোগ করে দিতেন। এতে সৌর সনের সঙ্গে দিনের ব্যবধান দূর হলেও তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি জনগণের কাছে স্পষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়ত সৌর বছরের ব্যবহারও সর্বত্র এক ছিল না। ফলে ভারতবর্ষের জন্য চান্দ্র ও সৌর দু'টি সনেরই পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

শাহী দরবারের চালু ছিল হিজরি সন। সম্রাট আকবর হিজরি সনের সঙ্গে সংগতি বিধান করে একটি সৌর সন জারির বিধান ঘোষণা করেন। তার

ঘোষণানুসারে চান্দ্র সনের সঙ্গে সৌর সনের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন সন চালু করা হয়। তখন বাংলায় প্রচলিত ছিল লক্ষণ সন। সম্রাট আকবরের নির্দেশে আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজী নতুন সনের পরিবর্তন ঘটান। সনটি ফসলি সন বা বঙ্গাব্দ হিসাবে চালু হয়।

বাংলার প্রাচুর্যের উৎস ছিল কৃষি সম্পদ। কৃষি কাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এদেশের জনগণের জীবনধারা। এ কারণে ফসলি সন হিসাবে চালু করা হয়েছে বঙ্গাব্দ। বঙ্গাব্দের সূচনা পর্বটি নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজন হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের ইংরেজি সন বা খ্রিস্টাব্দ এবং হিজরি সন। সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সন ১৫৫৬। বাংলা ১৪০০ সনে ইংরেজি সন ছিল ১৯৯৩। এই গণনা অনুসারে তিনি ১৯৯৩-১৫৫৬=৪৩৭ বছর আগে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন হিজরি সন ছিল ৯৬৩। ৪৩৭ + ৯৬৩ = ১৪০০ সন। অর্থাৎ সম্রাট আকবর যত বছর আগে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, সেই সঙ্গে তার সময়ের হিজরি সন যোগ করলেই বাংলা সন পাওয়া যায়। প্রথমে বঙ্গাব্দের প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখ মাস হয়ে ওঠে বঙ্গাব্দের প্রথম মাস।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের বঙ্গাব্দ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সুসংহত রূপ পরিগ্রহণ করে। চৈত্র সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে বাংলা মাস শেষ হয়। নতুন বছর শুরু হয় বৈশাখী উৎসবের মধ্য দিয়ে।

উৎসব

লোক সমাজে সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতেই উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ উৎসবের মাধ্যমে আবেগময় অভিজ্ঞতার বিনিময় করে। বেশিরভাগ উৎসবই ধর্মের সঙ্গে জড়িত। তবে উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে কারুপণ্যের বিপণনের জন্য। বাংলাদেশের প্রধান উৎসবের মধ্যে রয়েছে ঈদ, মুহররম, দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, বড় দিন, নববর্ষ প্রভৃতি।

বিশ্বের প্রতিটি জাতি নববর্ষ উদযাপন করে। নববর্ষ উদযাপনের মধ্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা রয়েছে। এ কারণে এ উৎসবকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নববর্ষের সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলা নববর্ষের বৈশাখ মাস একই সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টির মাস। নববর্ষ এলেই গাছে গাছে নতুন পাতার প্রস্ফুটন ঘটে। আম্র মুকুলের গন্ধে বাতাস মৌ মৌ করে। আলোর উৎসবে জেগে ওঠে মানুষের প্রাণ। অন্যদিকে কালবৈশাখী ঝড় বিভিন্ন জনপদ লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এর ধ্বংসযজ্ঞ মানুষের জীবনে সৃষ্টি

করে অপরিমেয় দুঃখ-কষ্ট। তা সত্ত্বেও মানুষ অন্যকে মিষ্টিমুখ করিয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানায়। নিজেরাও উন্নত মানের খাবার খায়।

বাংলা নববর্ষের সঙ্গে হালখাতার সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। 'হালখাতা'র হচ্ছে পুরোনো বছরের হিসাব-নিকাশ শেষ করে নতুন বছরের নতুন খাতা খোলার আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ। আগের দিনে নববর্ষ পালনের উৎসাহ দিতেন জমিদার ও মহাজনরা। জমিদাররা তাদের খাজনা আদায় করে কৃষকদের মিষ্টিমুখ করাতেন। এ সময় কৃষকরা জমিদারদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সুযোগ পেত। একইভাবে মহাজনরাও তাদের পুরোনো বছরের পাওনা আদায় করে নিতেন। এর ফলে মহাজন ও ক্রেতাদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক স্থাপিত হতো। বাকিতে লেনদেনের সুবিধা হতো।

জমিদার, মহাজন ও দোকানদাররা বছর শেষ হবার আগেই পাওনা আদায়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠতেন। জমিদাররা বসাতেন পুণ্যাহ। পুণ্যাহের দিনে সকল প্রজাই জমিদার বাড়িতে যেতেন। জমিদারের বাড়িতে বসত লাঠি খেলা। জমত কবি গানের আসর। জমিদার প্রজা সাধারণকে দর্শন দিতেন। এর সঙ্গে আয়োজন করা হতো চড়ক পূজা। চড়ক উৎসব শেষ হতো চৈত্র সংক্রান্তির দিনে। জমিদারদের খাজনা আদায়কে কেন্দ্র করে হালখাতার সূচনা হলেও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হলে হালখাতার ব্যবহারটি থেকে যায়। গ্রামের মহাজন ও দোকানদাররা উৎসাহের সঙ্গে তা পালন করতে থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর আবেদন হ্রাস পায়। বাকিতে সদাই বিক্রির রেওয়াজ উঠে যায়। দোকানদার ও ক্রেতার মধ্যে আস্থার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। ফলে নববর্ষে 'হালখাতা' খোলার উৎসব গুরুত্ব হারায়।

নববর্ষ উদযাপনের একটি প্রধান দিক হচ্ছে কারুপণ্যের মেলা। ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করেই মেলার জন্ম হয়েছে। কিন্তু নববর্ষে মেলার জন্ম হয়েছে রোজগার বাড়ানোর ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে। এর প্রাথমিক ধারণা এসেছে সমাবেশ ও বিকিকিনির ধারণা থেকে। আগে মেলা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। মেলার স্থান নির্বাচনে প্রাধান্য পেত গ্রামের বট-অশথ গাছের তলা, খোলা মাঠ, মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণ, ফকির-দরবেশের মাজার কিংবা সাধন পীঠ, তীর্থক্ষেত্র ইত্যাদি। কিন্তু সব মেলায়ই জাতীয় জীবনে সমান সাড়া পড়ে না। বৈশাখী মেলায় অংশগ্রহণ করে সারা দেশের মানুষ।

বাংলা নববর্ষের গ্রামীণ উৎসব নাগরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। পারস্যে পালিত হতো 'নওরোজ' উৎসব। পরবর্তী সময় তা মোগল সম্রাটরা পালন করত। বৈশাখী মেলার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ মেলা সাধারণ

মানুষ নিজস্ব উদ্যোগেই চালু করেছে। এরপর নববর্ষের উৎসব উদযাপনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে রাষ্ট্র।

আগের দিনে বৈশাখী মেলায় বিক্রি হতো মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কলসী-বাসন, হাতি, ঘোড়া, কাঠের আসবাব, জলচৌকি, খড়ম, দড়ির শিকা, বাঁশের বাঁশি, লোহার কাস্তে, দা-কুড়াল, তালের পাখা ইত্যাদি। এর সঙ্গে ছিল মুড়ি-মুড়কি, নানা রকম মিষ্টি, গরম জিলাপি ইত্যাদি। কোনো কোনো স্থানে সার্কাস ও পুতুল নাচের ব্যবস্থাও থাকত। ছোট ছেলে-মেয়েরা কাঁচা আম কাটার জন্য কিনত ছোট ছুরি। আধুনিক কালে এসব পণ্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু নববর্ষ উদযাপনের জাকজমক কমেনি। বরং নববর্ষ উদযাপনের জন্য সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নাচ ও গানের আয়োজন করে। ঢাকা নগরে বিক্রি হয় ইলিশ ভাজা ও পান্তা ভাত। ঢাকার রমনা বটমূলে ছায়ানট আয়োজন করে গানের অনুষ্ঠান। চারুকলা ইনস্টিটিউট বের করে বর্ণাঢ্য মিছিল। ঢাকা নগর রঙিন সাজে সেজে ওঠে।

এদেশের মানুষ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী। কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সমস্ত মনুষত্বের শক্তি অনুভব করিয়া বৃহৎ ...।'

নববর্ষের উৎসব রঙিন হয়ে ওঠে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে। উপজাতীয় সমাজে নৃত্য ও গীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বহু গোত্রের বিশ্বাস নৃত্য ও গীতে আছে ম্যাজিক শক্তি। তার দ্বারা দেবতা-দানব, মহামারী, বন্যা, দৈব-দুর্বিপাক বশ করা যায়।

বেশ কয়েকটি উপজাতির মধ্যে বিযু উৎসব বেশ জনপ্রিয়। বিযু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে চৈত্র সংক্রান্তির আগে। তা ১লা বৈশাখ পর্যন্ত চলে। তখন বনে বনে থাকে রঙ-বেরঙের ফুলের সমারোহ ও পাখির গান। অরণ্যবাসীদের মনেও লাগে উৎসবের রঙ। বিযু উৎসবে প্রকৃতি, বৃষ্টি ও ফসলের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পরিচয় হয়। পরে তা বিয়েতে রূপ নেয়। তাদের সমাবেশে মুখর হয়ে ওঠে পাহাড়ের পাদদেশ ও নদীর তীর। উপজাতীয় মানুষ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় বিক্রি করে তাঁতে বোনা কাপড়, পাহাড়ি ফল-মূল ও বুননযন্ত্র ইত্যাদি।

বাংলার মধ্যযুগের রাজধানী সোনারগাঁয়ে বসত অনেক কারুপণ্যের মেলা। সোনারগাঁয়ে চৈত্র সংক্রান্তির মেলার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, সেখানে সূক্ষ্ম মসলিন থেকে শুরু করে দুষ্প্রাপ্য মসলা, হাতির দাঁতের তৈরি পাটি এবং চিত্রিত কাঠের ঘোড়া বিক্রি হতো।

এক যুগে যা থাকে বিশ্বাস পরবর্তী যুগে তা হয়ে যায় সংস্কার। এ কারণেই উৎসব ও মেলার সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন নতুন উপকরণ। চড়কগাছের পরিবর্তে এসেছে দোলনায় চড়া। গ্রামীণ খেলার পরিবর্তে উৎসবে স্থান করে নিয়েছে জীবন্ত প্রদর্শনী। কারুশিল্পীরা মেলার মধ্যে নিজের পণ্য নিজেরা তৈরি করে বিক্রি করে। এতে লোকজ উৎসব একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীতে রূপ নেয়।

একদিনে কোনো জাতির জন্ম হয় না। শত শত বছর ধরে গঠিত হয় তার মূল্যবোধ। এদেশের মানুষের উৎসবেও তেমন পরিবর্তন এসেছে। সম্রাট আকবর বাংলা নববর্ষ চালু করেছিল ফসলি সন হিসাবে খাজনা আদায়ের জন্য। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে নববর্ষে সকল অফিস-আদালত বন্ধ থাকে। কোনো খাজনা আদায় হয় না। সরকারি উদ্যোগে উদযাপিত হয় দিনটি। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্রিটিশরা ইংরেজি নববর্ষ পালনের রেওয়াজ চালু করে। গান গেয়ে বর্ষবরণের পরিবর্তে তারা কামান-বন্দুক দেগে দিনটির উদ্বোধন করত। তখন থেকেই শুরু হয়েছে শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত কার্ড আদান-প্রদানের রীতি। পরবর্তী সময়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সঙ্গেও এই রীতিটি যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ আত্মদানের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে একুশের উৎসব। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। তাই প্রথম দিক উৎসবটি পালিত হয়েছে শোক দিবস হিসাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে তা আত্মগৌরবের দিবসে পরিণত হয়েছে। বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলা একুশের উৎসবকে দান করেছে নতুন মাত্রা। একুশে ফেব্রুয়ারি সকল স্তরের মানুষ নগ্ন পায়ে গান গাইতে গাইতে শহীদ মিনারের পাদদেশে মিলিত হয় এবং শহীদদের বেদীতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে। গানে গানে মুখর হয়ে ওঠে সারা বাংলাদেশ। এ উৎসবের সঙ্গে কারুপণ্য বিক্রির সম্পর্ক নেই। একুশের উৎসবটি হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিবেদনের উৎসব। বিশ্বের আর কোনো জাতি এ ধরনের ভাষা উৎসব পালন করে না। এ কারণে এটি হচ্ছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উৎসব।

উৎসবের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে একটি জাতির মূল্যবোধ ও জাতীয় অনুভূতি। এ কারণেই মুসলমানদের জন্য ঈদোৎসব সর্ববৃহৎ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এদেশে হিন্দুদের দুর্গাপূজাও আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এক সময় বাঙালির জীবনকে আনন্দ-মুখর করে রেখেছিল বাঙলার পালা-পার্বণ। সে সময় এখানে বার মাসে তের পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। সেগুলোর মধ্যে চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হতো শিবের গাজন। গাজনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল 'মেলা'। রবীন্দ্রনাথ তার 'শিশু' কবিতায় লিখেছেন, মেলা বসবে গাজনতলার

হাটে। গাজনের আরেকটি অনুষঙ্গ ছিল ব্যঙ্গাত্মক 'সং' শোভাযাত্রা। গাজনের শেষ দিনে হতো চড়ক। চড়ক উৎসবটি রোমহর্ষক। এ উপলক্ষে একটি কাঠের স্তম্ভের মাথায় একটি বাঁশ বাঁধা হতো। সন্নাসীরা পিঠে বড়শির মতো শলাকা বিধিয়ে আড়ভাবে বাঁধা বাঁশের সঙ্গে ঝুলে চড়কগাছে পাক খেত। একে অনেকেই অমানুষিক মনে করত। এক পর্যায়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা এ প্রথা বন্ধের অনুরোধ জানান। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। ১৮৬৫ সালের ১৫ই মার্চ ইংরেজ সরকার চড়কাগাছে দোল খাওয়ার উৎসবটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে উৎসবটি মোটেই জনপ্রিয় হয়নি।

বাঙালির বার মাসে তের পার্বণের মধ্যে দুর্গাপূজার উৎসবই জাকাল। এ উৎসবটি বাঙালি হিন্দুদের নিজস্ব উৎসব। উত্তর ভারতের প্রধান উৎসব হচ্ছে হোলি, পশ্চিম ভারতের দেওয়ালি; কিন্তু বাঙালি হিন্দুদের জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা। এ পূজার বর্ণভেদ নেই। তাই সকল শ্রেণীর মানুষ এ উৎসবে অংশ নেয়। দুর্গাপূজার উদ্ভব হয়েছে বাংলাদেশেই। এর মূলে রয়েছে বাঙালিদের মাতৃভক্তি।

পূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিছু পূজা নির্ভর শিল্প। কুমারদের মধ্যে এক শ্রেণীর কারিগর রয়েছেন, যারা প্রতিমা তৈরি করে। প্রতিমা গড়া হয় কাঠের কাঠামোর উপর। প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিমা তৈরির এ রীতি চলে এসেছে। দুর্গাপূজা থেকে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত কুমোরদের ব্যবসা থাকে জমজমাট।

একসময় প্রতিমা তৈরির শিল্পীরা বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় যেত। এরপর সরস্বতী পূজা শেষ হলে এদেশে চলে আসত। মিষ্টান্ন ও যাত্রাগান ছিল পূজা নির্ভর শিল্প। দুর্গাপূজায় মিষ্টির উৎসব যোগ হয়েছে ইংরেজ আমলে। আগের দিনে পূজার সময় খই-মুড়কি ও নারকেলের নাড়ুর ছড়াছড়ি ছিল। বিজয়া দশমীর দিন অতিথিদের নারকেলের তৈরি মিষ্টান্ন দেয়া হতো। সেই চল উঠে গিয়েছে। আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাবে দুর্গাপূজার সময় অনুষ্ঠিত যাত্রাগানের প্রদর্শনী একরকম উঠেই গিয়েছে।

একসময় নবান্ন ছিল বাংলাদেশে লোকাচার সম্পৃক্ত প্রধান উৎসব। এদেশের আদিম নরগোষ্ঠী নবান্ন উৎসবের প্রচলন করে। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। হেমন্ত ঋতুতে ধান কাটাকে কেন্দ্র করে এ উৎসবের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যকে কেন্দ্র করেই এর ব্যাপ্তি বেড়ে যায়। পৃথিবীর নানা দেশে নতুন ফসল ওঠাকে কেন্দ্র করে নবান্ন উৎসব উদযাপিত হয়। আমেরিকায় এ দিনটি 'থ্যাঙ্কস গিভিং ডে'

হিসাবে উদযাপিত হয়। সারাদেশ আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। কানাডায় নবান্ন উৎসব উপলক্ষে গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা হয়। রাশিয়ার রাদুনিৎমা এ ধরনের একটি উৎসব।

বাংলাদেশে হেমন্ত আসে মৃদু পদক্ষেপে। ধানের উপর শিশির ফোঁটা জমে থাকার মতো করেই হেমন্ত ঋতুতে কৃষকের মনে থাকে আনন্দের উৎসারণ। ফসল কাটার শুভ দিনে ধানের ক্ষেত থেকে পাকা ধান কেটে আটি বেঁধে কৃষকরা বাড়িতে নিয়ে যেত। এ ধানকে বলা হতো 'আগধান' বা 'যাত্রাধান'। এর মধ্য থেকে কিছু ধান ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখত কৃষকরা। বাকি অংশ ধান থেকে চাল তৈরি করে পায়েস রান্না করা হতো। তা ঘরের সবাই মিলে খেত। এরপর শুরু হতো ধান কাটার পালা। নতুন চাল দিয়ে ঘরে ঘরে তৈরি করা হতো নানা রকম পিঠা। এ সব পিঠার মধ্যে ছিল পোয়া পিঠা, চিতল পিঠা, পাক্কন পিঠা, চকাপিঠা, পাটি সাপটা, ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা আরো অনেক রকম পিঠা। পিঠাতে থাকত নানা রকম ফুল, পাখি, মাছ, লতা-পাতা, কুলা, সরা ইত্যাদির কারুকাজ। পিঠার গায়ে লেখা থাকত 'সুখে থাক', 'ভুল না আমায়' ইত্যাদি শুভেচ্ছা বক্তব্য। নবান্নের সময় বাড়ির উঠোন ও ঘরের দরজায় বিচিত্র রকম আলপনা আঁকার ধুম পড়ে যেত। সবুজ বিপ্লবের পর নবান্নের উৎসবে ভাটা পড়ে।

লোক সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ অংশ হচ্ছে পুঁথি সাহিত্য। গ্রামের নিরক্ষর মহিলারাও এর সঙ্গে পরিচিত। একসময় কাহিনী ভিত্তিক পুঁথি সাহিত্য এমন জনপ্রিয় ছিল যে, ফেরিওয়ালারা তা বিক্রি করত। গবেষকরা সপ্তদশ শতকের আগেরও পুঁথির সন্ধান পেয়েছেন। বাস্তবে পুঁথির প্রচলন হয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে শাহ গরীবুল্লাহ রচনা করেন তার বিখ্যাত পুঁথি 'আমীর হামযা', 'ইউসুফ-জুলেখা' ও 'জঙ্গনামা' পুঁথি। এরপর পুঁথি রচনা করেন কাজী হায়াত মাহমুদ, সৈয়দ হামযা, সাদেক আলী প্রমুখ। সৈয়দ হামযার 'জৈগুন বিবি', 'হাতিম তাই', মালে মুহাম্মদের 'ছয়ফুল মুল্লুক ও বদীউজ্জামান' ও মোহাম্মদ কাতেরের 'লায়লী মজনু' ইত্যাদি পুঁথি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পুঁথি রচনার সূচনা হয়েছে মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে। পুঁথির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে নবী-রসুলের জীবন-কাহিনী, ইসলামের বিধি-বিধান, নায়ক-নায়িকার প্রেম কাহিনী ও ধর্মযুদ্ধ। পুঁথিতে ব্যাপক হারে আঞ্চলিক, উর্দু, ফারসি ও আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পুঁথির ভাষা ছিল খুবই সহজ-সরল। তা গ্রামের নিরক্ষর মানুষের কাছেও বোধগম্য। আধুনিক জীবনের স্পর্শে পুঁথির কদর অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

লিখন পদ্ধতি

পাথর যুগের মানুষ লিখতে জানত না। তারা মনের ভাব প্রকাশ করত অঙ্গভঙ্গি দিয়ে, কণ্ঠ নি:সৃত কিছু ধ্বনি উচ্চারণ করে। খুব ধীরে ধীরে মানুষ লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। প্রথম দিকে মিশরীয়রা মনের ভাব প্রকাশ করত ছবি এঁকে। এরপর অক্ষরের মাধ্যমে। মিশরের অক্ষর ভিত্তিক চিত্রলিপিকে বলা হতো 'হায়ারেগ্লিফিক'। এর অর্থ হচ্ছে 'পবিত্র লিপি'। এসব লিপির মাধ্যমে লেখা হতো ধর্মের বাণী ও রাজার নির্দেশ।

প্রথম দিকে লিপি খোদাই করা হতো পাথর ও কাঠের গায়ে। এরপর মিশরের মানুষ নলখাগড়া জাতীয় গাছের মণ্ড দিয়ে কাগজ তৈরি করতে শিখেছে। এ জাতীয় গাছের নাম ছিল প্যাপিরাস। কাগজের নামও হয়েছে প্যাপিরাস। দীর্ঘ প্যাপিরাসের গায়ে লিপিকারগণ লিখতেন ধর্মের বাণী এবং রাজার নির্দেশ। অন্যান্য দেশের চেয়ে চীনের সভ্যতা ছিল অনেকটা পৃথক। তাই সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে। চীনে শাং রাজাদের যুগে শাং লিপিকাররা রেশমী কাপড়ের গায়ে লিখতেন। তাদের লেখা ছিল অনেকটা চিত্রলিপির মতো।

একেক সভ্যতার লিখন পদ্ধতি ছিল একেক রকম। সুমেরীয়রা কাদামাটির নরম শ্লেটে খাগের কলম দিয়ে এক ধরণের কৌণিক রেখা ফুটিয়ে তুলত। খাজকাটা লেখাগুলো ছিল অনেকটা তীরের মতো। আবার কোনোটা ছিল ইংরেজি ভি (v) বর্ণের মতো। অক্ষর ভিত্তিক এ ধরনের বর্ণমালাকে বলা হতো কিউনিফর্ম।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গিয়েছে প্রায় আড়াই হাজার সীল। সীলগুলোতে ছিল ষাড়, মহিষ প্রভৃতি পশুর প্রতিকৃতি। এগুলো এক ধরণের চিত্রলিপি বলে মনে করা হয়। চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ায় লিপির উদ্ভব ঘটে। সেখানে নলখাগড়া জাতীয় গাছ প্যাপিরাস পাওয়া যেত না। সেখানকার লিপিকাররা শ্লেট বা এটেল মাটির ফলকে লিখতেন। মাটির ফলককে টেকসই ও শক্ত করার জন্য রোদে শুকানো হতো এবং আগুনে পোড়ানো হতো। মেসোপটেমিয়ার লিপিকাররা প্রথমে লিখতেন ছবি এঁকে। কিন্তু মাটির উপরে ছবি আঁকার কাজটি ছিল কঠিন। এরপর তারা সাংকেতিক চিহ্ন কিংবা বর্ণ অক্ষরের উদ্ভাবন করে। লেখার কাজে প্রায় হাজার খানেক বর্ণ ব্যবহার করা হতো। তাদের লিপি পরিচিত ছিল কিউনিফর্ম বা কীলকাকৃতির লিপি হিসাবে।

সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে বাইশটি ব্যঞ্জন বর্ণ উদ্ভাবন। পরে তাদের বর্ণমালার সঙ্গে গ্রিকরা স্বরবর্ণ যুক্ত করেছে।

প্রাচীন ভারতে লিপি আষ্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ফিনিশীয় বর্ণমালা। তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যবহৃত বর্ণমালার মাধ্যমে ধ্বনি বুঝানো হতো। আর কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হতো শব্দাংশ বোঝানোর জন্য। লিপি আবিস্কারের পরেই শ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত গাঁথা, পুরাণ কাহিনী এবং কবিতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভারতের প্রাচীনতম মহাকাব্য 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত'।

মহাভারতের কাহিনীর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুই রাজপরিবারের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে রাজকুমার রামের স্ত্রী বন্দি হবার পর তাকে উদ্ধার করার কাহিনী। রাম হনুমানদের নিয়ে হনুমান বাহিনী এবং ভল্লুকদের নিয়ে ভল্লুক বাহিনী গঠন করে শ্রীলঙ্কায় উপস্থিত হন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে স্ত্রী সীতাকে মুক্ত করেন। সুকুমার সেন লিখেছেন, 'তৃতীয় 'খ্রিস্টপূর্বাব্দের ব্রাহ্মীর ব্রাহ্মী লিপি স্থানকারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে আধুনিক ভারতীয় এবং পূর্ব-এশীয় বিবিধ লিপিমালায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে আশোক লিপির সমকালের অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে।'

তিনি আরো লিখেছেন, 'গুপ্ত শাসন কালে ব্রাহ্মী লিপি ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে রূপ গ্রহণ করেছিল তাকে কুটিল লিপি বলা হয়। এই কুটিল লিপি থেকে বাঙ্গালা লিপির উদ্ভব। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা বর্ণমালা নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছিল।'

ভারত উমহাদেশে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায়-ই সর্বাধিক মানুষ কথা বলে। বাংলা ভাষার প্রচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে চর্যাপদ। ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙ্গালা সাহিত্যের শুরু ধরেছেন ৬৪০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি সপ্তম শতকের একটি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে কয়েকটি বাঙ্গালা শব্দের অস্তিত্ব খঁজে পান। লিপি ও সাহিত্যের উদ্ভব বিবেচনা করলে বোঝা যায়, বাংলাদেশে সভ্যতার উদয় হয়েছে অনেক পড়ে। মধ্যযুগের শেষে এসে এর দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। তবে এর আগেই উন্নত কৃষি সভ্যতা বিকশিত হয়েছে।

প্রাচীন কালের মানুষ পাহাড়ের গায়ে, পাথরের বুকে এবং প্যাপিরাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের লেখা যুগ থেকে যুগান্তরে পৌছে দিয়েছে। এর বহু পরে আবিষ্কৃত হয়েছে কাগজ। ১০৫ খ্রিস্টাব্দে ত্সাই লুন কাগজ তৈরি করেন। চীনারা কাগজ তৈরির কলা-কৌশল বছরের পর বছর গোপন রাখে। যখন কোরিয়া চীনের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত ছিল তখন জাপানিরা কোরিয়ানদের কাছ থেকে কাগজ তৈরি শেখে। ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে মুসলমান শাসন কায়েমের পর

ইউরোপে প্রথম বারের মতো কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। এরপর ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইতালি এবং ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি, ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড এবং ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। কাগজ হচ্ছে সভ্যতার বাহন। মানুষের মহাকালের চিন্তাকে বাঁধা হয়েছে কাগজের মাধ্যমে কালো অক্ষরে।

পেশার রূপান্তর

প্রাচীন বাংলায় যারা ছিল কারিগর আধুনিক কালে তারা হয়েছে শ্রমিক। নগর সভ্যতার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে ধনী দেশগুলোতে বড় বড় শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। আর দরিদ্র দেশগুলোতে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশে গড়ে উঠেছে কিছু শিল্প-কারখানা। কিন্তু তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। বরং গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের অবস্থা দুর্বল হয়েছে। একই সঙ্গে বদলে গেছে পেশার ধরন। কারিগর রূপান্তরিত হয়েছে দিনমজুর কিংবা শ্রমিকে।

সামন্ত অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। কৃষিনির্ভর এবং ছোট শিল্পনির্ভর সমাজগুলো তেমন বড় হয় না। ক্ষুদ্র গৃহশিল্পগুলোও গ্রামকেন্দ্রিক হয়। কারণ তা কৃষি কর্মের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি বিস্তার লাভ করেছে কুটির শিল্পগুলো। কৃষি কর্মের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ধাতুশিল্প, বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি। কৃষি কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই উৎপাদিত হতো গ্রামে।

যাদের পেশা ছিল কৃষি তারা স্বাভাবিক কারণেই বসবাস করতো জমির কাছাকাছি। নানা রকম ভয়ভীতির জন্য গৃহস্থ্যদের বাড়িগুলো পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল। এভাবেই বিভিন্ন পেশার লোক নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি পাড়া। পাড়া ও গ্রামের গড়নের উৎস ছিল প্রাচীন কৌম সমাজ। চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসেও বদলায়নি গ্রামের চেহারা। কারণ গ্রামীণ অর্থনীতির মূল উৎস কৃষি এবং ছোটখাটো শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়নি। একদিকে হালের বলদ, আখ-মাড়াই কল, অন্যদিকে তাঁত আর চরকাই ছিল তাদের উৎপাদন যন্ত্র। একই গ্রামে বাস করতো কাংসকার, কুম্ভকার, চিত্রকর, সূত্রধর, ডুলে, ব্যাধ, ডোম, জোলা, বেদে ইত্যাদি শ্রেণীর লোক। পেশার উপর নির্ভর করেই প্রাচীন বাংলায় সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণী বিভক্তি।

প্রাচীন বাংলার একেবারে প্রথম দিকে অর্থনৈতিক বিন্যাসের প্রধান উৎস ছিল শিকার, কৌম কৃষি ও ছোটখাটো গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয়

প্রথম-দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত চাষাবাদ ও গৃহশিল্প অর্থনৈতিক বিন্যাসের একটি প্রধান উৎস হলেও ধন উৎপাদনের বড় উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। অষ্টম শতক থেকে আবার শুরু হয় একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর অর্থব্যবস্থা। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

বিচিত্র নরগোষ্ঠীর লোক নিয়ে যেমন বাঙালির জনসৌধ গঠিত হয়েছে, তেমনি তাদের পেশাও বিচিত্র। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে পালটিয়েছে তাদের জীবনধারনের পদ্ধতি ও পেশা। পেশার মধ্য দিযে চিহ্নিত হয়েছে তাদের সামাজিক অবস্থান। প্রাচীন বাংলার এক শ্রেণীর লোকের পেশা ছিল শিকার। শবর, চণ্ডল, পুলিন্দ ও ব্যাধ ইত্যাদি গোত্রের লোক ছিল তারা। তারা ছিল সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর লোক। হরিণ, বাঘ ইত্যাদি বন্য প্রাণী শিকার-ই ছিল তাদের পেশা। পশুর চামড়া ও মাংস বিক্রি করে চলত তাদের সংসার। চর্যাপদ ও মঙ্গল কাব্যে তাদের কথা উল্লেখ আছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতির ফলকে শিকারের চিত্র আছে।

প্রাচীন বাংলায় চিনি ছিল অন্যতম প্রধান কুটির শিল্প। ত্রয়োদশ শতকে চিনি ছিল বাংলাদেশের একটি প্রধান রফতানি পণ্য। এ সময়ে মার্কোপোলো চিনি রফতানির কথা উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ ভারত চিনি রফতানির ব্যাপারে ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন পর্তুগিজ পর্যটকও ষোড়শ শতকে সিংহল, আরব ও পারস্যে চিনি রফতানির কথা উল্লেখ করেছেন।

বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব থেকেই ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। এর কারণ কৌমবদ্ধ বাঙালির জীবন যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানেই ছড়িয়ে ছিল বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি। অধিকাংশ গ্রামই ছিল স্বনির্ভর। একটি গ্রাম স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যে সমস্ত পেশার লোক প্রয়োজন তার সবই ছিল প্রতিটি গ্রামে। একই গ্রামে পাশাপাশি বাস করত শিকারি, কৃষক, তাঁতি, কুম্ভকার, কর্মকার, ক্ষৌরকার ইত্যাদি। এ সমস্ত পেশার লোকদের জীবনধারা ভেঙে পড়েছে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার কবলে পড়ে। তারা পা বাড়িয়েছে শহরের দিকে। পরিণত হয়েছে মিল শ্রমিক বা অন্য কোনো পেশাজীবী লোকে।

প্রাচীনকালে কামার, কুমার, তাঁতি, কাসারি প্রভৃতি কারিগর ছিল বটে; কিন্তু তারা কৃষির সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। হস্তশিল্পের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে তাদের পেশা। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়। উন্নত কৃষিকাজ এবং হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল শহরগুলো। সামন্ত যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হস্ত ও কারিগরি শিল্প। কারিগররা নিজেরাই তৈরি করত উৎপাদনের বিভিন্ন হাতিয়ার।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুঁজিপতিরাই কারখানার মালিক। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতি ইউরোপে পুঁজিবাদের একটি উচ্চতর স্তরের সূচনা করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কারিগরি শিল্প থেকে কারখানা প্রথায় উত্তরণ। এ স্তরের উৎপাদন প্রথাকে মার্ক্স নাম দিয়েছেন মেশিনোফ্যাকচারার বা কারখানা উৎপাদন প্রথা।

সময়ের আঘাতে বদলে যায় সমাজের উৎপাদন যন্ত্র। একইভাবে বদলে যায় মানুষের জীবনধারণের পদ্ধতি ও পেশা। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে মানুষ বদলে নিয়েছে উৎপাদন যন্ত্র। একজন সহিসের ঘোড়ার গাড়ি পেয়েছে বাসের গতি। একজন কারিগরের হাত সহস্রগুণ শক্তিশালী হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে শ্রমিকের হাতে।

নগর জীবনে ব্যক্তি ও কর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে একটি দূরত্ব। সামন্ত সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েছে পুঁজিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা। ফলে হারিয়ে গিয়েছে বহু পুরনো পেশা, সৃষ্টি হয়েছে নতুন পেশা, নতুন জীবনযাপন। কৃষি ক্ষেত্রে ঘটেছে শিল্প পণ্যের প্রসার। সেচ পাম্পের শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে পরিবেশ। গড়ে উঠেছে আধুনিক নগর। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক নগর ও বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

অধ্যায় : দুই

গঙ্গারিডি থেকে সোনারগাঁও

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল অস্থায়ী। মানুষেরই প্রচেষ্টায় স্থায়ী নিবাসের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে গ্রাম। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজ করে কিংবা পশু পালন করে। নগরের মানুষ অকৃষিজ হস্তশিল্প এবং নানা রকম কর্মে নিযুক্ত থাকে। সাধারণত গ্রামের তুলনায় শহরের লোকসংখ্যা থাকে বেশি।

শিকারজীবী মানুষ কৃষি উৎপাদনে প্রবেশের জন্য বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে রয়েছে নতুন নতুন শস্যবীজের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পশু নির্বীর্যকরণের মাধ্যমে হালে জুড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করণ। এতে পেশীশক্তির ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং একই সঙ্গে শস্য উৎপাদন বেড়েছে। অন্যদিকে মানুষ উদ্ভাবন করেছে মাকু এবং তাঁত, কুমারের চাকা, গরুর গাড়ির চাকা, বাঁকা তুরপুণ, তামা-বিগলন পদ্ধতি ইত্যাদি। ফলে মানুষের উৎপাদন দক্ষতা অনেক বেড়েছে। এসব যন্ত্র আবিষ্কার করতে মানুষের শত শত বছর সময় লেগেছে। যখন থেকে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে, তখন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে শহরের। শহর সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ সমৃদ্ধির সোপানে পা রেখেছে।

সিন্ধু সভ্যতায় কৃষি কাজের পরই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে কুম্ভকারের হস্তশিল্প। এ কারণে সিন্ধু মৃৎপাত্রগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ। মৃৎপাত্রগুলো কুমারের চাকা দিয়ে নানা উপযোগিতা অনুসারে তৈরি করা হয়েছে।

পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যের মধ্যে নারী, পুরুষ, গাড়ি, পশু ইত্যাদি শিল্পকর্মও পাওয়া গিয়েছে। এগুলো খেলনা হিসাবেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, মানুষ তার পণ্যকে শুধু নিত্য ব্যবহার্য কাজেই ব্যবহার করেনি, বিনোদনের উপাদান হিসাবেও ব্যবহার করেছে। এর ফলে নগরবাসী মানুষের মধ্যে গ্রামীণ পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে।

৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার পাঞ্জাবে এসে উপনীত হন। তখন পাঞ্জাব ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। ফলে তিনি সহজেই পাঞ্জাবের রাষ্ট্রগুলো দখল করে নেন। এরপর তার বিজয়াভিযান থেমে যায়। তিনি সংবাদ পান ভারতের অভ্যন্তরে প্রাসিওই ও গঙ্গারিডি নামে দুটি পরাক্রমশালী রাষ্ট্র রয়েছে। তাদের রয়েছে বিশাল সৈন্যবাহিনী। তারা আলেকজান্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অপেক্ষা করছে। এ কথা শুনে আলেকজান্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রিক ও রোমান লেখকরাও গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের মানুষের বীরত্বের প্রশংসা করেন। কিন্তু তাদের লেখা থেকে গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে, বর্তমান কুষ্টিয়া জেলায় গঙ্গারিডির অবস্থান ছিল। এই প্রদেশের নৃপতির ৪০০০ রণহস্তি এবং অন্যান্য সমরসজ্জা ছিল।

সমাজ বিজ্ঞানীদের অনুমান গঙ্গারিডি রাষ্ট্র গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত ছিল। গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের বন্দরের নাম ছিল 'গাঙ্গে'। গঙ্গারিডি রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'বাঙলার কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে। ৩০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাটালিপুতে মেগাস্থিনিস নামে এক রাষ্ট্রদূত আসেন। এদেশে মেগাস্থিনিস বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'ইন্ডিকা' নামে একটি ভৌগোলিক গ্রন্থ লেখেন। সেই গ্রন্থে 'গঙ্গারিডি' রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টলেমির ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থের বর্ণনায় 'গাঙ্গে' বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতকে আরো একাধিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে 'গঙ্গারিডি' রাষ্ট্রের উল্লেখ রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ভারতে রচিত হয়েছে 'মহাভারত' ও 'জাতক' গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে 'গঙ্গারিডি' রাষ্ট্র কিংবা 'গাঙ্গে' বন্দরের উল্লেখ নেই। অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এর প্রমাণ রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব প্রত্ন দ্রব্য, পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক পাওয়া গিয়েছে, সে সব নিদর্শনে চিত্রিত মানুষের বেশভূষা, পাদুকা ও কেশবিন্যাসে গ্রিক ও রোমান শিল্পরীতির প্রভাব রয়েছে। গঙ্গারিডির রূপান্তরিত নাম হচ্ছে গঙ্গাহৃদি, গঙ্গা হৃদয়, গঙ্গারাষ্ট্র ইত্যাদি। বাংলাদেশে এর চেয়ে আর কোনো প্রাচীন নগরের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কৃষি উৎপাদনে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে কৃষির পাশাপাশি কারুশিল্প গড়ে উঠেছিল। চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দের শেষ দিকে গ্রিক পণ্ডিততরা বঙ্গে সুতিবস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। তখন প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই সে সময়ের তাঁতযন্ত্র ছিল বাংলাদেশের নিজস্ব। এর বিকাশ ঘটেছে ধীরে ধীরে। পরবর্তী সময়ে উন্নত গ্রাম থেকেই নগরের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে তেমন কোনো বৃহৎ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর কারণ এদেশ কখনই কৃষি উৎপাদনের প্রাচীন ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে আদি-পর্বের শেষ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বাঙলার চেহারা ও প্রকৃতি একই রকম ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে এসেও এর তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। নিহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন কৌশলেরও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ সময় একদিকে গরু ও লাঙল, আখমাড়াই যন্ত্র, অন্যদিকে তকলী ও তাঁতই ছিল প্রধান উৎপাদন যন্ত্র। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভূমি ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়নি। তবে এ সময়ের মধ্যে বাঙলার বেশ কিছু নগরের পত্তন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম নগর তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ছিল সুপরিচিত। মহাভারত ও পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। অষ্টম শতক পর্যন্ত এই সামুদ্রিক বন্দরের খ্যাতি অক্ষুণ্ন ছিল। কর্ণসুবর্ণ প্রাচীন পশ্চিম বাঙলার আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ নগর। সপ্তম শতকে কর্ণসুবর্ণ ছিল বঙ্গের রাজধানী। এ সময় এটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

পুণ্ড্রবর্ধন ছিল উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বিখ্যাত নগর। বগুড়া জেলার মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই সুপ্রাচীন নগরটির সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান, চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাঁচা মাটির ইটের শহরটির নির্মাণ শুরু হয়েছিল। অবশ্য সে আমলের কোনো স্থাপনা পাওয়া যায়নি। তবে অসংখ্য প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে এর বিকাশ ঘটেছে। মৌর্য শাসনামলে (৩২০-১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নগরটি 'পুণ্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল।

এটি একটি প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। চারকোনাকার শহরটি গড়ে উঠেছিল করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে। এটি উত্তর-দক্ষিণে ১.৫২৩ কিঃমিঃ দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১.৩৭১ কিঃ মিঃ প্রশস্ত ছিল। মহাস্থান করতোয়া নদীর নতুন ও পুরানো খাত দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত ছিল যে, যার জন্য শহরটিকে দ্বীপের মতো মনে হতো। সম্রাট অশোক পুণ্ড্রবর্ধনের রাষ্ট্র ভাণ্ডার থেকে দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত প্রজাদেরকে ধান, গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা দেয়ার নির্দেশ দেন বলে ব্রাহ্মী ভাষায় লিখিত শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে।

প্রাচীনকালে যে সব গ্রাম জলপথের সংযোগ স্থলে ছিল, সে সব গ্রাম অপেক্ষাকৃত উর্বর ও উন্নত ছিল। শিল্প-বাণিজ্যের সুযোগও ছিল বেশি। অধিকতর সমৃদ্ধ গ্রাম ঘিরে শহরের সৃষ্টি হয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধনের সৃষ্টি হয়েছিল একই কারণে। এলাকাটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-কর্মে উন্নত ছিল। পুণ্ড্রনগরের পরবর্তী ইতিহাস থেকে এর সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

পুথিজাত নিদর্শনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হচ্ছে উয়ান চুয়াঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে উয়ান চুয়াঙ লিখেছেন, 'এ রাজধানীর বিস্তৃতি ৩০ লী অর্থাৎ ৭.৫ কিঃ মিটার। এটি বহু স্তূপ, মঠ ও মন্দির দিয়ে সুসজ্জিত।' বার-তের শতকের পুথিতে পুণ্ড্রবর্ধনকে দেবতাদের নিবাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাস্থান, পুণ্ড্রবর্ধন এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার লোকগাঁথার বহু প্রচলিত নাম জড়িয়ে রয়েছে। এসব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে বেহুলা, লক্ষীন্দর, চাঁদ সওদাগর, পরশুরাম, নিতাই ধোপানি, শেলাদেবী প্রমুখ।

পুলিন্দ-শবর-ব্রাত্য ও দস্যু ভুয়িষ্ঠ জাতির সঙ্গে পুণ্ড্র জাতির নাম পাওয়া গিয়েছে ঐতবেয়-ব্রাহ্মণে। এ ব্যাপারে ভাষাবিদ সুকুমার সেনের অভিমত হচ্ছে, পুণ্ড্র নাম থেকে বাঙলায় আখের নাম হয়েছে পুড় এবং একজাতের দেশী আখের নাম হয়েছে পুড়ি। একই সূত্রে আখবাড়ির দেবতার নাম হয়েছে পুণ্ড্রাসুর। তিনি আরো বলেন, খাশ বাঙ্গালা দেশে সবচেয়ে যে পুরোনো লেখ পাওয়া গিয়েছে, তা একটি পাথরের চাকতি। এর অক্ষর অশোকের সমসাময়িক, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এই লিপিতে পুণ্ড্রনগরের নাম উল্লেখ আছে। পরবর্তী সময়ে পুণ্ড্রনগরই পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত হয়। অশোকের সময় পুণ্ড্রবর্ধন বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল। নীহাররঞ্জন রায় পুণ্ড্রবর্ধন নগর গড়ে ওঠার একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন।

যেমন–

- ❑ করতোয়া নগর একটি বিখ্যাত তীর্থকেন্দ্র ছিল।
- ❑ এই নগর বৃহৎ এক রাজ্য ও জনপদের রাজধানী ও প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল।
- ❑ এই নগর সর্বভারতীয় ও আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।
- ❑ একাধিক স্থলপথ এবং প্রশস্ত করতোয়ার জলপথ এই কেন্দ্রে মিলিত হয়েছিল।

বৌদ্ধপুরাণ মতে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কিছুদিন পুণ্ড্রবর্ধনে কাটিয়েছেন এবং নিজের ধর্মমত প্রচার করেছেন। গুপ্ত আমলে এই নগর পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির ভুক্তিকেন্দ্র ছিল এবং সেই সময় থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পুণ্ড্রনগর কখনো তার মর্যাদার আসন থেকে বিচ্যুত হয়নি। দ্বাদশ শতকের 'করতোয়া-মাহাত্ম' গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনকে আদিভবন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নগরটি করতোয়ার বাম তীরে মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ৩০ বর্গ মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর দুটি অংশ। এক অংশ পরিখা বেষ্টিত ও দেয়াল চিহ্নিত। এটি চারদিকের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু। এর ধ্বংসাবশেষ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মাটি-ইট-পাথরের স্তূপ এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুকরোয় আকীর্ণ। পশ্চিম দিকে উত্তর কোণের কাছে প্রধান নগরদ্বার। নগরদ্বারটি তাম্রদরজা নামে খ্যাত।

পুণ্ড্রবর্ধন নগরের অভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় প্রাসাদ এবং রাষ্ট্রের কর্মকর্তা, সৈন্য সামন্ত, বণিক-নাগরিকদের গৃহ-সভাগৃহ। সমাজ সেবক ও শ্রমিকরা বসবাস করতেন নগরের উপকণ্ঠে। সেখানে মন্দির ও ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম প্রাচীন নগর ছিল শ্রীবিক্রমপুর। চন্দ্র, বর্মন, সেন ও দেববংশীয় রাজাদের অন্যতম প্রধান জয়স্কন্ধর ছিল বিক্রমপুরে। সেন রাজাদের কয়েকটি রাজধানী ছিল। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে বিক্রমপুর। মুন্সিগঞ্জ জেলার বজ্রযোগিনী এবং পাইকপাড়া গ্রামের কাছে রামপাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে আরেকটি ধ্বংসাবশেষ। এর আয়তন প্রায় পনেরো বর্গ মাইল। রামপালের উত্তরে ছিল ইছামতি নদী। এই নদীর নিম্ন প্রবাহ ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গে মিশে গিয়েছে। প্রাচীনকালে সমগ্র এলাকাটি নিচু ভূমি ছিল। এই কারণে ছোট-বড় দীঘি কেটে নগরভূমিকে সমতল করা হয়েছে। সীমানাবেষ্টিত বিস্তৃত নগরের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

ইছামতির প্রাচীন খাতের পাশে একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ নগরটিকে দুইভাবে বিভক্ত করেছে। নিহাররঞ্জন রায় অনুমান করেছেন একাদশ শতকের শেষার্ধে পালরাজ রামপালই নগরটির খ্যাতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, সমগ্র বিক্রমপুর পরগনার এমন সুপ্রশস্ত এবং ভৌগোলিক দিক থেকে এমন সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি।

কথিত আছে বুদ্ধদেবের জন্মের আগে বঙ্গরাজ্যের একজন ত্যাজ্যপুত্র সাত শত লোক নিয়ে নৌকাযোগে লঙ্কা দ্বীপ দখল করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এরপর থেকে লঙ্কাদ্বীপের নাম হয়েছে সিংহল দ্বীপ। রামায়নের কোথাও লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল নেই। বিজয় সিংহ কর্তৃক লঙ্কাদ্বীপ অধিকৃত হবার পর লঙ্কার নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ক্রমে ক্রমে সিংহল হিসাবে ফুটে উঠেছে। যারা ভারতবংশীয় বলে নিজেরা গৌরব করতেন, তারা বিয়ে সূত্রে বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা করার আগ্রহ দেখাতেন। বঙ্গ রাজারা নিজেদের রুচি প্রকাশের জন্য নিজেদের রাজধানী সুন্দর করে গড়ে তুলতেন। নৌ যোগাযোগের সুবিধার জন্য তাদের রাজধানী নদীর তীরে স্থাপিত হতো।

প্রাচীনকালে নির্মিত নগরগুলো রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাহাড়পুর ও শালবন বিহার গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে। বৌদ্ধ বিহারগুলোর প্রত্যেকটিই শিক্ষাপিঠ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈষ্ণবদের মঠবাড়িগুলোও তাই।

প্রতিটি শহরেই বসবাস করত অকৃষিজীবী পেশার লোক। তাদের মধ্যে ছিল ভুক্তিপতি, বিষয়াপতি মণ্ডলাধিপতি, বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মচারি, কর্মকার, কংসকার, শঙ্খকার, মালাকার, সূত্রধর, তন্তুরায়, সুবর্ণবণিক, গান্ধবণিক, বস্তুকার প্রমুখ। নগরের বাসিন্দারা ছিল স্বচ্ছল। সে সময় গ্রামের সম্পত্তি শহরে গিয়ে জমা হতো। ফলে শহরগুলো ছিল স্বচ্ছল।

বাংলাদেশের প্রাচীন নগরগুলো কালের করাল গ্রাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলো খননের মাধ্যমে যেসব প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মসজিদ, বিহার, মন্দির, মঠ, পাঁচিল, ইটের ফল, দেবদেবীর মূর্তি, বুদ্ধের মূর্তি, রঙিন মাটির তৈজসপত্র, বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা ইত্যাদি। একসময় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবশালী ছিল। আর বৌদ্ধ রাজ-রাজারা ছিলেন অত্যন্ত উদার। ফলে তাদের পক্ষে পুণ্ড্রবর্ধনের মতো একটি সমৃদ্ধশালী নগর গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের প্রধান নগর ছিল সোনারগাঁও।

বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ে শুর, পাল ও দেব বংশের রাজ-রাজারা রাজত্ব করেন। এখানে মুসলিম রাজত্বের সূচনা হয় ১২৮১ সালে। ১৩৩৮ সালে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের সময় সোনারগাঁও বাংলার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। এরপর সোনারগাঁও শাসন করেন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দার শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, শামস্উদ্দিন হামজা শাহ, শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ প্রমুখ। ঈশা খাঁর আমলে সোনারগাঁও বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কথিত রয়েছে ১৫৭৫ সালে ঈশা খাঁ মোগল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এতে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন।

সোনারগাঁয়ে বহু সিদ্ধ পুরুষ ভ্রমণে এসে থেকে যান। তারা এখানে প্রতিষ্ঠা করেন সমাধি ভবন, মক্তব ও খানকা। সিদ্ধ পুরুষ মওলানা শরফউদ্দীন তাওয়ামা প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী মাদ্রাসা। এসব প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন ইবনে বতুতা, মাহুয়ান, ফাহিয়েন, রালফ ফিচ প্রমুখ। সোনারগাঁয়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে গোয়ালদী মসজিদ, পানাম ব্রিজ, পাঁচপীরের মাজার, সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সমাধি, দমদম দুর্গ, দানিশ মান্দের সমাধি, মানা শাহের মাজার ইত্যাদি। সোনারগাঁয়ের সঙ্গে চীন, মিশর, সিংহল, পেগু, মালাক্কা ও সুমাত্রার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এখান থেকে বিদেশে রফতানি হতো মসলিন, ঝিনুকের অলঙ্কার, চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতি, পুতুল ইত্যাদি।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৩৪৫) মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমণ করে লিখেছেন, 'সোনারগাঁও একটি দেয়াল ঘেরা শহর। এখানে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। রয়েছে খাল, রাস্তা ও বাজার।' এখান থেকে বহির্বিশ্বে বহু দ্রব্য রফতানি হয়। বহু দ্রব্য আমদানি হয়। ১৫৫৮ সালে রালফ ফিচ লিখেছেন, 'শ্রীপুর থেকে বার মাইল দূরে সর্বোত্তম ও সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র পাওয়া যায়।'

ইবনে বতুতা সোনারগাঁও-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী হিসাবে বর্ণনা করেন। তার সময়ে চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে সোনারগাঁও-র সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। চীনের পরিব্রাজক মাহুয়ান সোনারগাঁওকে একটি বাণিজ্যিক শহর রূপে বর্ণনা করেন।

সোনারগাঁও-র সঙ্গে ছিল জাভা দ্বীপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। ষোল শতকে দিল্লীর শাসক শের শাহ সিন্ধু থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করেন। সড়কটি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত ছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, মধ্যযুগে উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল সোনারগাঁও। সোনারগাঁয়ের মসলিনের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সোনারগাঁও নগরের কাঠের কারুপণ্যের খ্যাতি ছিল বিশ্বের বহু দেশে। প্রাচীন লোকমেলা লাঙলবন্দের মাধ্যমে সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের হাতি, ঘোড়া ও পুতুল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে সেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। বিংশ শতাব্দীতে সোনারগাঁয়ের কাঠের চিত্রিত হাতি ও ঘোড়ার পুরোনো ঐতিহ্য এখনো টিকে আছে। সোনারগাঁয়েই নির্মিত হয়েছে কারুশিল্পগ্রাম।

মানুষের অভিযান

মানুষের অগ্রসর হবার সংগ্রাম কোনো বাধার মুখে থেমে যায়নি। মানুষ প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়ে কিংবা প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে গিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলেছে। এসব বাঁধা ছিল বিভিন্ন চরিত্রের। মানুষ বাঁধা অতিক্রম করতে গিয়েই বিভিন্ন কৌশল এবং প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। প্রাচীনকালে মানুষের সামনে প্রাকৃতিক কিংবা ভৌগোলিক বাধাটিই ছিল বড়। এসব বাধার মধ্যে ছিল বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, বন্য পশুর আক্রমণ ইত্যাদি। কঠিন সংগ্রাম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষ এসব বাঁধা অতিক্রম করেছে। ধর্মীয় কাহিনীগুলোতেই দুটি শক্তির উপস্থিতি দেখা যায়-দানব ও দেবতা কিংবা ঈশ্বর ও শয়তান। শক্তির দ্বন্দ্বে দানব কিংবা শয়তান পরাজিত হয়েছে।

মিশর সভ্যতার স্রষ্টারা নীল নদের অববাহিকতায় বসতি গড়তে গিয়ে নীল নদের বন্যা আর চারপাশের বন-জঙ্গলের মুখোমুখি হয়েছে। তারা বন্যা ঠেকাতে নদীতে বাঁধ দিয়েছে। জলসেচের জন্য খনন করেছে খাল। একইভাবে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছে সে এলাকার মানুষ।

উষর মরুভূমির বুকেও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। শুষ্ক পাথুরে মাটি খুঁড়ে মানুষ পানি তুলেছে। এই পানির প্রবাহে সৃষ্টি করেছে বাগান। আর প্রতিটি সভ্যতা নির্মাণের পেছনে আছে মানুষের শ্রম, মেধা ও উদ্ভাবন শক্তি। এসব সভ্যতার

সুবিধা ভোগ করেছে শাসক, পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়। আর বঞ্চিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। এ কারণে অর্থনৈতিক প্রশ্নে শাসক ও শোষিতের সৃষ্টি হয়েছে সংঘাত ও সংঘর্ষ। ৭০-৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে বিশ্বের প্রথম 'দাস বিদ্রোহ'। ফলে শাসকদের পতন হয়েছে।

রোমে দাস নারীদের ব্যবহার করা হয়েছে অনৈতিকভাবে। এর ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়েছে। অরাজকতার সুযোগ নিয়ে বিদেশি শত্রুরা রোমকে পর্যুদস্ত করেছে। তখন রোমে কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার আইন ছিল না। ফলে কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির উত্থানে রোমান সভ্যতা দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

রোমান সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে জন্মহার হ্রাসের কথাও বলা হয়। কিন্তু অনেকে এ বক্তব্যকে যৌক্তিক বলে মনে করেন না। কারণ গ্রিসের উন্নতির চূড়ান্ত যুগে জনশক্তি ছিল অসম্ভব কম।

মানব জাতির ইতিহাস হচ্ছে বিজয়ের ইতিহাস। শাসকরা ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ টিকে রয়েছে। সাধারণ মানুষই হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে টেকসই চরিত্র। তাদের মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ। তারা নিজেদের সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। অন্যের সংস্কৃতি আত্মস্থ করে নিজেদের সংস্কৃতি উন্নত করেছে। রেড ইন্ডিয়ানরা শেতাঙ্গদের কাছ থেকে শিখেছে ঘোড়ার ব্যবহার। চীনাদের কাছ থেকে পাশ্চাত্যের জনগণ শিখেছে রেশম, চা ও কাগজের ব্যবহার। পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে দিয়েছে গাজর, আঙুর ও কাঁচের দ্রব্য ও রোমান শিল্পকলা।

ইউরোপিয়ানরা নতুন বিশ্ব থেকে শিখেছে তামাক, আলু ও চকোলেটের ব্যবহার। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্র। মধ্যযুগে মোগল সম্রাটরা পেয়েছে বাংলার মসলিন। বিশ্ব গ্রিকদের কাছ থেকে পেয়েছে ট্র্যাজেডি এবং ভারতের কাছ থেকে পেয়েছে প্রাচীনতম গ্রন্থ 'বেদ'। গ্রিস ও রোমের কাছ থেকে মানুষ শিখেছে বীরত্বের অনুকরণ। মোগল রাজদরবারের রাজন্যবর্গরা সম্রাটদের কাছ থেকে শিখেছে পারস্যের রীতিনীতি ও আদব কায়দা।

অনেক সময় এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে কখনো বা শান্তিপূর্ণভাবে, আবার কখনো বা শক্তি প্রয়োগ করে। নাৎসি জার্মানি জোর করে পোল্যান্ডসহ ইউরোপের কিছু রাষ্ট্রের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। জাপান তা চেয়েছে দূর প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে। আবার

একই সংস্কৃতির উৎস থেকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দুটি সংস্কৃতির ধারা। তার পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। আবার পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ে বাঙালি হয়েও জাতি-রাষ্ট্রের পরিচয়ে হয়েছে বাংলাদেশী।

কোনো জাতিই এককভাবে বিশ্বের সকল সংস্কৃতির অংশীদার হতে পারে না। প্রাচীনকালে মিশরীয়রা মানব জাতিকে উপহার দিয়েছে পিরামিড, চীনের কনফুসিয়াস দিয়েছেন নৈতিকতার দর্শন এবং হোমার উপহার দিয়েছেন মহাকাব্য। মধ্যযুগে ইসলাম উপহার দিয়েছে রাজতন্ত্র বিরোধী দর্শন। এ দর্শনের মূল কথা ছিল অন্য আর দশজনের মতো রাজাও সাধারণ মানুষ। তাকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার অধিকার রয়েছে সাধারণ মানুষের।

ইসলাম পূর্ব যুগে আরব ভূমির মানুষ বহু গোত্র ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এ কারণে সেখানে কোনো কোনো ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। হযরত মুহম্মদ (সা:) আরবদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তখন আরবের বাইরে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মহানবী (সা:)-র মৃত্যুর পর তাঁর খলিফাগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্যোগ নেন। মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে চার খলিফার শাসনকাল ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে রয়েছেন খলিফা আবুবকর (রা:), হযরত ওমর (রা:), হযরত উসমান (রা:) ও হযরত আলী (রা:)। ইসলামের ইতিহাসে এ চার খলিফার শাসনকালকে বলা হয় 'খুলাফায়ে রাশেদুন'।

পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দের শেষ দিকে জার্মানির বর্বর গোত্রগুলোর আক্রমণে প্রাচীন সভ্যতার অবসান ঘটে এবং মধ্যযুগের উদয় হয়। সে সময় দেখা দেয় স্থবিরতা, অজ্ঞতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত মধ্যযুগের প্রথম পর্যায় 'অন্ধকার যুগ' হিসাবে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে একক ব্যতিক্রম হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। ইসলামের মানবিক আবেদনে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় উন্নয়নের অনুপ্রেরণা। খোলাফায়ে রাশিদুনের পর মুসলিম খিলাফত চলে যায় উমাইয়া ও আব্বাসীর বংশের হাতে।

উমাইয়া আমলে রাজধানী ছিল দামেস্কে। আব্বাসী আমলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় বাগদাদে। রাজ্য ও ধর্ম বিস্তারের মাধ্যমে মুসলমানগণ প্রায় সকল রকম উন্নত সভ্যতার স্পর্শে আসে। মুসলিম গার্হস্থ্য জীবনে মেঝেতে কার্পেট বিছানো হতো। খাবার সরবরাহ করা হতো ট্রেতে। মুসলমানদের গোসলখানায় ব্যবহৃত হতো উষ্ণ ও শীতল পানি। মুসলিম বণিকদের রফতানি

পণ্যের মধ্যে ছিল চিনি, তুলা, খেজুর, পশম ও ইস্পাতের যন্ত্রপাতি। ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। মানুষের শরীরে অস্ত্রোপচারের উদ্ভাবন মুসলিম সভ্যতার দান। আব্বাসীয় আমলে বাগদাদসহ বড় বড় শহরে গড়ে ওঠে হাসপাতাল।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায় আড়াইশ বছর টিকেছিল। এর মধ্যে প্রায় দেড়শ বছর ছিল মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। এর আকার ও সম্পদ ছিল অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের চেয়ে বেশি। মোগল সম্রাটরা তাদের ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা দিয়ে একটি গতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ষোল শতকের প্রথম ভাগে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য আকবরের আমলে উন্নতির শিখরে পৌঁছে।

মোগল সম্রাটরা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন করলেও কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন করতে পারেননি। তাই সম্রাটদের একাধিক সন্তান থাকায় তারা উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যেতে ব্যর্থ হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। একইভাবে জাহাঙ্গীরের পুত্রও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সবচেয়ে নির্মম ছিল শাহজাহানের সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ। উত্তরাধিকারের সংঘাত মোগল সাম্রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। একই সঙ্গে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের জন্ম দেয়। নূরজাহানের কারণে শাহজাদা খুররমের কাবুল অভিযানের পরিচালনা বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে কাবুল অঞ্চল মোগলদের হাতছাড়া হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সফল সম্রাট ছিলেন আওরঙ্গজেব। কিন্তু তিনি যোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পারেননি। ফলে তার মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

ভারতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় একশত বছর পর সমগ্র বাংলা মোগল অধিকারে আসে। বাংলার সুবাদারদের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করতে হতো। স্বাধীন সুলতানী আমলে দুশ বছর বাংলা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র থাকায় যাবতীয় সম্পদ এদেশেই ব্যবহৃত হতো। মোগল আমলে এদেশের সম্পদ চলে যেতে থাকে দিল্লীতে। তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার মানুষের জীবনে মোগল আভিজাত্যের ছাপ পড়ে। জমিদারদের পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসে। তারা মোগল অনুকরণে পরতে শুরু করে জড়িদার মুক্তা বসানো ঝলমলে আসকান-সালোয়ার। বাঙালির মাছ-ভাত-ব্যঞ্জনের পাশাপাশি ঘি দিয়ে রান্না করা খাদ্য স্থান করে নেয় বাঙালির জীবনে।

সুলতানী আমলের মতো মোগল আমলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন ছিল। মোগল আমলে পারস্যের সুফি দর্শনের সঙ্গে বাংলার ভক্তিবাদের সংমিশ্রণ ঘটে। এভাবেই বাংলার মরমী মতবাদের সৃষ্টি হয়।

পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় হয়েছে যোগ-সাধনা। আর পূর্ব বঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অধ্যাত্ম-সাধনা। যোগ-সাধকরা দেহকেন্দ্রিক যোগ-সাধনার মাধ্যমে দেহ ও মনের শুদ্ধিতে বিশ্বাস করেন। হিন্দু যোগ-সাধনায় ঈশ্বর প্রাপ্তি আর বৌদ্ধ যোগ-সাধনার বন্ধুত্ব প্রাপ্তির কথা আছে। ইসলামের সুফি ভাবধারায় আছে সৃষ্টিকর্তার সাথে একাত্ম হওয়ার কথা। 'ফানাফিল্লাহ' হচ্ছে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির বিলীন হওয়ার তত্ত্ব।

মরমিয়াবাদ হচ্ছে একটি ধর্মীয় দার্শনিক পরিভাষা। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণমধর্মে সুফি দর্শনের প্রভাব পড়েছে। হিন্দুর সামগানে ভক্তির প্রভাব আছে, কিন্তু তা জিকিরের মতো নয়। জিকির ও কীর্তনে ভক্তির সঙ্গে ঐশী প্রেম যুক্ত হয়ে একটি স্বতন্ত্র দর্শনের জন্ম হয়েছে। আর এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষকে ভালোবাসার প্রত্যয়। জন্ম নিয়েছে বাউল মতবাদ। আর লালন শাহ ছিলেন এর শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার আখড়া নির্মাণ করে তিনি নিজে সাধন-ভজন করতেন। আর ভক্তদের বাউল মতে দীক্ষা দিতেন। তার শিষ্যরাও তার দর্শন প্রচার করতেন। শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই প্রমুখ।

বাউল দর্শনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া ভাবধারা ও মুসলিম সুফিতত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। মূলত বাউল মত হচ্ছে একটি আঞ্চলিক লোকধর্ম। এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সাধারণ মানুষের যুগ-সঞ্চিত বেদনা, বঞ্চনা-হতাশা এবং ঘর বিমুখ দর্শন।

যখন সমাজে শিক্ষা ছিল না আর মানুষ ছিল পরাধীনতার নিগড়ে বন্দি, তখন বাউলরা অধ্যাত্ম দর্শনের আলো জ্বেলে মনের অন্ধকার দূর করতে চেয়েছেন। তাই লোকধর্ম ছিল লোক শিক্ষণের একটি ভিন্ন রূপ।

বাউলদের সাধনা ছিল নিষ্কাম প্রেমের মাধ্যমে মানব-জন্মকে সফল করার একটি প্রয়াস। আর তাদের অধ্যাত্ম সাধনার মূল কেন্দ্র ছিল মানবদেহ। বেদে আছে নিজেকে চেনো। খ্রিস্টান ধর্মে আছে নিজেকে জানো। আর লালন বলেছেন, নিজেকে জানার মাধ্যমে আত্মাকে চোখে দেখা যায়। বাউল দর্শনে নিজেকে নিজের মধ্যে বিলীন করে দেয়ার যে অভিব্যক্তি রয়েছে, তার শেকড় প্রোথিত রয়েছে সুফি দর্শনে। সুফি দর্শনে রয়েছে নিজেকে জানলে সৃষ্টিকর্তাকে জানা যায়। লালন বলেছেন, 'একবার আপনারে চিনতে পারলে রে/যাবে

অচেনারে চেনা'। লালনের এ চেতনা ধর্মীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয়েছে।

প্রযুক্তির চরিত্র আন্তর্জাতিক। একটি ঘড়ি কিংবা গাড়ি প্রতিটি দেশেই ঘড়ি কিংবা গাড়িই। অন্য কিছু নয়। কিন্তু সংস্কৃতিকে সুনির্দিষ্ট সমাজগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। এর একটি স্থানীয় আঞ্চলিক রূপ রয়েছে। আবার এর সঙ্গেই মিশ্রিত হয়েছে বিশ্বমানবতার কল্লোল ধ্বনি। সংস্কৃতির উপকরণগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এক অঞ্চলের সংস্কৃতির উপকরণ অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। কিন্তু এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিলীন হয়নি। যেমন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাষা বহু বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভাষার উচ্চারণ রীতি কিংবা শব্দ গঠনের কৌশল বদলায়নি।

ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা একই সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতাকে বহন করে এবং চিন্তার বিকাশ ঘটায়। বাংলা ভাষার আদি কবি সরহপার রচনায় পাই তার সময়ের সমাজের বিভিন্ন উপকরণ, সংস্কার ও ধর্মার্চনার বর্ণনা। তিনি বলেছেন, জীবনের কোনো কিছু হারায় না। তার কবিতায় আছে বৌদ্ধ ধর্মের বিনয় ও ত্যাগের আদর্শ। তিনি জাতিভেদের মূল উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব মতবাদ এবং সুফি মতবাদে সরহপাহর চিন্তারই বিস্তার ঘটে। লালনও একই লোকধর্ম অনুসরণ করেছেন। এ কারণেই বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে তিনটি বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। একটি হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা, বিনয় ও ত্যাগ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈষ্ণবীর প্রেম এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ। এসব দর্শনের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে মরমিয়াবাদের দর্শন। এসব দর্শনের রূপকাররা নিরক্ষর মানুষের মনে অধ্যাত্মবাদের আলো জ্বেলে কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করেছেন। এ কারণে বাঙালিরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের নিশ্চল অন্ধকারে ডুবে থেকেও ইচ্ছা ও আনন্দের সংকল্পকে সজীব রাখতে পেরেছে।

বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এদেশের জনগণকে কোমল আর শান্ত স্বভাবের করেছে। একই সঙ্গে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও কালবৈশাখী ঝড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তারা হয়েছে সাহসী। নদীর গতিপথের পরিবর্তনের দরুণ গ্রামের পর গ্রামের জনবসতি ভেঙ্গেছে। অসংখ্য নগর ও বন্দর ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশের মানুষ নিজেদের জীবন ধারাকে টিকিয়ে রেখেছে।

বিদেশীরা এদেশে এসেই বিমোহিত হয়েছে। বাংলার সুলতানরা ছিলেন শুষ্ক অঞ্চলের মানুষ। তারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতেন। এদেশে এসেই তারা

নৌশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারা মধ্যযুগের শুরুতেই গড়ে তোলেন দক্ষ নৌবহর।

প্রাকৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশের রয়েছে চমৎকার অবস্থান। পাহাড়-পর্বত আর নদ-নদী এদেশকে আগলা করে রেখেছে বিদেশীদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে। তাই প্রাচীনকালে বাংলাদেশ ছিল স্বাধীন।

উত্তর ভারত থেকে এদেশে আসার দুটি পথ খোলা ছিল। একটি পথ উত্তর বিহারের মধ্য দিয়ে এবং অপরটি রাজমহলের নিকট তেলিয়াগর্হির সরু পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ জয় করা খুব সহজ ছিল না। যারা এদেশে এসেছেন, তারা বেশি দিন টিকে থাকতে পারেননি। যারা এদেশে থেকে গেছেন, তারা এদেশের জীবনধারাকে আত্মস্থ করে থেকে গেছেন।

একজন গ্রিক পর্যটকের বর্ণনায় রয়েছে, "ভারতবর্ষে বঙ্গজাতির বাস। তাদের মধ্যে 'গঙ্গারিডই' জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের চার সহস্র বৃহৎকার সুসজ্জিত রণহস্তী আছে। এই জন্যই অপর কোনো রাজা এদেশকে জয় করতে পারেনি।" স্বয়ং আলেকজান্ডার সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনে এই জাতিকে পরাস্ত করার দুরাশা ত্যাগ করেন। এ দেশের মানুষের মনে বার বার ভাব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এসব বিপ্লবের মাধ্যমে সমধর্মী সাংস্কৃতিক চিন্তার অধিকারী হয়েছে তারা। সমধর্মী চিন্তার মধ্যে রয়েছে বর্ণময় জীবনের প্রস্ফুটন।

এদেশের সকল মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলে। তা সত্ত্বেও ভৌগোলিক কারণে এক অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির পার্থক্য রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু নৃত্য ও গীত মূলধারার সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। চর্যাপদ বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে বাংলাদেশের গীতি কবিতার ধারাকে। বাংলাদেশের লৌকিক উপকরণের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু উপকরণ সংমিশ্রিত হয়েছে।

এদেশের সংস্কৃতিতে রয়েছে ইসলামের প্রবল প্রভাব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব। বঙ্গবাসীরা তিব্বতে গিয়েছে। ব্রহ্মদেশে গিয়েছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে নিজের প্রভাব বলয় রচনা করেছে। তারা অন্য অঞ্চলের মানুষকে নতুন চিন্তা উপহার দিয়েছে। আবার অন্যদের কাছ থেকেও লাভ করেছে অনেক কিছু। বঙ্গের চিত্রকলার বিশেষ একটি লক্ষ্মণ ছিল। সেগুলো পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। নেপাল ও তিব্বতে প্রবেশ করেছে। বঙ্গ সংস্কৃতিতে বিদেশের স্থাপত্যশিল্প এবং গৃহ নির্মাণ শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পাল আমলে স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল বৌদ্ধ বিহার এবং স্তূপ। বৌদ্ধরা সংসারত্যাগী এবং নির্জনতা প্রিয়। তাই তারা বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করেছে

বাইরের আলো-বাতাস থেকে দূরে। যেখানে বিহার ও স্তূপ নির্মিত হয়েছে, সেখানে পৃথিবীর কোলাহল ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের মন্দিরগুলো অনেকটা উন্মুক্ত ছিল। মুসলমানদের আগমনের পর এদেশের স্থাপত্য রীতির পরিবর্তন ঘটে। মসজিদগুলোর নির্মাণশৈলীতে তা প্রতিফলিত হয়েছে। নামাজে সমবেত হবার জন্য মসজিদগুলো ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু বসতি নির্মাণের শৈলী এদেশের মানুষের চিন্তারই ফসল।

উর্বর জনপদের অধিবাসী হিসাবে বাঙালিরা সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই ধান চাষ করতো। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত গ্রহণের রীতি তখন থেকেই শুরু হয়েছে। এটা আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর দান। নিহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙালীর ইতিহাস' আদি পর্ব গ্রন্থে লিখেছেন "উচ্চ কোটির লোক থেকে শুরু করে নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত এবং হাড়িত ভাত নাহি, নিতি আবেশী, এটাই বাঙালী জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ।" বাঙালি ভাত আহার করত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। বাঙালির খাদ্য সংস্কৃতির আদি পর্বে গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক ছিল নিত্যদিনের খাবার। অভিজাত ও শিকারজীবী মানুষের প্রিয় খাদ্য ছিল হরিণের মাংস। প্রিয় ফলের মধ্যে ছিল কলা, আম ও কাঁঠাল।

আদি-অস্ট্রেলীয় অষ্ট্রিক ভাষাভাষী লোকদের দান কলা। প্রাচীন বাঙলার চিত্র ও ভাস্কর্যে কলার ভারে নত কলাগাছের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। আদিকাল থেকেই খাদ্য গ্রহণের রীতি বাঙালির দৈনন্দিন জীবনকে উপভোগ্য করেছে। এ কারণেই বাঙালিরা পরিচিত হয়েছে ভোজন রসিক হিসাবে। তারা নিজেদের তাগিদেই উৎসবে-পার্বণে খাদ্য-তালিকায় যুক্ত করেছে নতুন নতুন খাদ্য- পোলাও, কোর্মা, রেজালা ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সমন্বয়

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। দেব বংশের রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব। কোনো বাঙালি রাজবংশ বাংলায় নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাংলার স্বাধীন সুলতানরা ছিলেন মুসলমান। মোগলরাও ছিলেন মুসলমান।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজশক্তির ক্ষমতার ভিত্তি ছিল ধর্ম। কোনো রাজা ধর্মকে বর্জন করে দেশ শাসন করতে পারেননি। বাংলার সংস্কৃতির মূল শক্তি নিহিত রয়েছে বহু ধর্ম ও মতাদর্শের মধ্যে। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ধর্মপাল গর্গা নামে এক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। নারায়ণ পাল একটি শিব মন্দির স্থাপন করেন। মদন পালের রাণী 'মহাভারত' পাঠ শুনে এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন। এসব ঘটনার মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রতি বৌদ্ধদের সহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর বিপরীত চিত্রও রয়েছে। রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে কুশী নগরের একটি বিহারকে মন্দিরে পরিণত করেন এবং সেখানে বুদ্ধমূর্তির পরিবর্তে শিবমূর্তি স্থাপনের আদেশ দেন।

মুসলমান সুলতানরা ছিলেন উদার। তারা বাংলাকে আরব ভূমিতে পরিণত করতে চাননি। বরং এদেশের আচার-অনুষ্ঠানকে তারা আত্মস্থ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গেছেন। কিন্তু বাংলার মানুষের পরম দুর্ভাগ্য যে, তাদেরকে পর পর দুটি বিদেশী ভাষা ফার্সি ও ইংরেজি আত্মস্থ করে নিজেদের

চাকুরি যোগাড় করতে হয়েছে। ফার্সি ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি রয়ে গেছে রাষ্ট্রশক্তির মর্মমূলে।

পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা ইংরেজরা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তছনছ করে দেয়। তাদের আমলে ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে এক কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ছিল। দুর্ভিক্ষের পর যারা বেঁচে ছিল, তারাও নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি বা দাসবৃত্তিকে গ্রহণ করে। দুর্ভিক্ষের পর বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ ফসলি জমি অনাবাদী হয়ে পড়েছিল। এসব দৃশ্য মধ্যবিত্ত মানুষ দেখেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। কারণ, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ফরাসি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে ওঠেনি।

মূলত মোগল আমলেই বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণী আত্মবিস্মৃত হয়। এ কারণে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। তারা রাষ্ট্র সচেতন ছিল না। তাদের কাছে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনও স্বাভাবিক মনে হয়েছে। যেদিন সিরাজের মৃত্যু হয়, সেদিন তার লাশ মুর্শিদাবাদে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ঘোরানো হয়। তাকে দেশপ্রেমিক হিসাবে চিনতে বাঙালির দেড়শত বছর সময় লাগে। এরপর তারা সিরাজের জন্য হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। ঈসা খাঁর বীরত্ব আর সিরাজের করুণ মৃত্যু বাঙালির আত্মদর্শনে যোগ করে নতুন মাত্রা।

বাংলাদেশ হবার পর বাংলাদেশের জাতিসত্তা নির্ণয়ের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব অর্জন করে। এটা করা হয় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের তাড়না থেকে। এর একটি বিকৃত রূপও দাঁড় করানো হয় নিজেদের স্বার্থে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে যে জনসমষ্টি নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয়, তাদের সব সময়ই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই তারা সর্বভারতীয় আদর্শের মায়াবি হাতছানির শিকারে পরিণত হয়নি।

বাংলাদেশে জাতি গঠনের বহু উপাদান প্রাচীনকালেও ছিল। কিন্তু কোনো শাসক একে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রূপ দিতে পারেনি। খৃস্টপূর্ব যুগে 'গঙ্গারিডি' নামে প্রাচীন রাষ্ট্রের নাম পাওয়া গেলেও তার কাঠামোগত রূপ পাওয়া যায়নি। বরং পরবর্তী সময়ে পুন্ড্রবর্ধনের একটি বাস্তব রূপ পাওয়া যায়। পুন্ড্ররা প্রাচীন বাঙালি হলেও তাদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ের উন্মেষ ও অন্তর্ধানের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। গুপ্ত পরবর্তী যুগে বাঙালির সংস্কৃতি ও লোকাচার একটি সংহত রূপ নেয়।

অষ্টম শতাব্দীতে পালরা বাঙালির রাষ্ট্র শক্তির কেন্দ্র স্থাপন করে। তুর্কি শাসনামলে ভূ-খণ্ডের 'বাঙলা' নাম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আঠার শতকে নবাবরা

স্বাধীন হলেও বাংলা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের অধীন। উনিশ শতক পর্যন্ত বাঙালির মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব ছিল বলেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বাঙালিকে দ্বিখণ্ডিত করে। সে পথ ধরে সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান। বাঙালি রাষ্ট্রীয় চেতনায় ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম পালনের ব্রতকে কঠিন আদর্শ হিসাবে নেয়। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের পার্থক্য হচ্ছে, ইসলাম একই সঙ্গে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। মুসলমান শাসকরা ছিলেন একই সঙ্গে ধর্মের রক্ষক ও প্রচারক। অন্যকে ধর্মান্তরিত করা ছিল মুসলমানদের কর্তব্য।

যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে পারে; কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষ হিন্দু হতে পারে না। হিন্দু ধর্মের জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা একটি নিশ্চল সামাজিক দর্শনের সৃষ্টি করে। এ কারণে মধ্যযুগে হিন্দু ধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্রীতদাসেরও রাজা হবার ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থা শ্রেণী সংঘাতকে অনেক দূরে ঠেলে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু সুলতান ও মোগলরা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তেমন সফল হয়নি। তবে বর্ণবৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়। মোগল আমলে জমির রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং জায়গীরদারী ব্যবস্থা প্রযুক্তির উন্নতিকে নিরুৎসাহিত করে। সে আমলে হস্তশিল্প ও কারুপণ্যের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হলেও কারিগররা ছিল নিঃস্ব ও সম্পদহীন। প্রাচীন ভারতেই এর প্রাথমিক বীজ রোপিত ছিল।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় ভারত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় স্থানীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে। এ সংঘাত দীর্ঘ সময় অব্যাহত ছিল। প্রাচীন ভারতে ধর্মে ধর্মে সংঘাত এবং রাজ-রাজাদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আর্যাবর্তে ধর্ম বিপ্লবের মূল কারণ ছিল কঠোর জাতিভেদ। ব্রাহ্মণদের জাত্যাভিমানের কারণে ক্ষত্রিয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ধর্মীয় অত্যাচারে শূদ্ররা প্রচলিত ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আর্যধর্মের পরিবর্তে নতুন ধর্মমত প্রচার শুরু করে। এ সময় জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

জৈনধর্মের প্রধান নীতি ছিল কঠোর আত্মসংযম। তারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তারা মনে করত মানবাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশই হচ্ছে ভগবান। বৌদ্ধধর্মও বেদের অভ্রান্ত অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে। তারা হিন্দুধর্মের পশুবলীর ঘোর বিরোধী ছিল। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল লোভ সংবরণ। লোভ ত্যাগের মাধ্যমেই দুঃখ থেকে মানুষ মুক্তি পায়। বৌদ্ধরা ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করা থেকে দূরে থাকে।

জৈনধর্মের প্রচারক মহাবীর এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচারক গৌতম উভয়ের জন্ম ক্ষত্রিয় বংশে। তারা মানুষকে বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন যাপনের পরামর্শ দেন। জৈনধর্ম আত্মহত্যাকে অনুমোদন দেয়। বৌদ্ধধর্মে আত্মহত্যাকে মহাপাপ হিসাবে গণ্য করে। বৌদ্ধরা প্রতিমা পূজা থেকে বিরত থাকায় ভারত থেকে উৎখাত হয়। কিন্তু জৈনগণ নিজেদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। ফলে তারা ভারত থেকে বিতাড়িত হয়নি। এ সময় ব্রাহ্মণগুের চেয়ে ক্ষত্রিয়রা বেশি ক্ষমতাশালী ছিল। মৌর্য রাজবংশের স্থপতি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ক্ষত্রিয় ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসন লাভ করেন তার পুত্র বিন্দুসার। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেন অশোক। অশোক তার নিজের ভাইদের পরাজিত করে নিজের ক্ষমতা সংহত করেন। একাধিক ভাইকেও তিনি হত্যা করেন।

প্রথম জীবনে অশোক ছিলেন রাজ্যলিপ্সু ও নিষ্ঠুর। কলিঙ্গ যুদ্ধে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পর তিনি অনুতপ্ত হন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যদের মধ্যে গৃহ বিবাদ শুরু হয়। মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথ তার সেনাপতি পুষ্যমিত্রের হাতে নিহত হন। এর ফলে মৌর্য রাজাদের ১৩৭ বছরের রাজত্বের অবসান ঘটে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে মৌর্য সাম্রাজের পতনের পর ভারত উপমহাদেশ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পুষ্যমিত্র যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম ছিল শুঙ্গ বংশ। শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা নিহত হন তার মন্ত্রী বাসুদেবের হাতে। ভারত সাম্রাজ্যের অরাজকতার মূল কারণ ছিল রাজবংশগুলোর মধ্যে গৃহবিবাদ, আপন জনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে সংঘাত। এ কারণেই ভারতবর্ষ বিদেশীদের আক্রমণে বার বার পর্যুদস্ত হয়েছে। জনজীবনে সৃষ্টি হয়েছে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট। রাজ-রাজারা প্রজাদের কল্যাণ কামনার চেয়ে নিজেদের সিংহাসন রক্ষায় বেশি ব্যস্ত ছিলেন।

গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের উত্থানে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি হয়। এ সময় কালিদাসের জন্ম হয়। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনীগুলো মহাকাব্যে রূপ নেয়। এর ফলে শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। একই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।

গুপ্তযুগের সাহিত্য জাত্যাভিমানের প্রভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও সে সময়ে আবির্ভূত হন গণিতবিদ আর্যভট্ট, বৃহৎ সহিংসতার রচয়িতা বরাহমিহির, জ্যোতির্বিদ গর্গ ও ব্রহ্মগুপ্ত। এ সময়ের অজন্তার প্রাচীর-চিত্র বিশ্ব

সভ্যতার কাছে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়। কিন্তু হূণদের দুর্ধর্ষ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে হূণ শক্তিও পরাজিত হয়। তাদের পরাজয়ের পর বাংলাদেশের মহাধিরাজ শশাঙ্ক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। সপ্ত শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি গৌড়-রাজ্য অর্থাৎ বাংলাদেশ শাসনে নিজের শক্তির পরিচয় দেন। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের কাছে কর্ণসুবর্ণ নগরে। তিনি ধীরে ধীরে সম্রাটে পরিণত হন এবং 'মহাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেন। তার মৃত্যুর পর বাংলায় ঘোর অরাজকতা দেখা দেয়। শতাব্দীকাল ধরে চলে এই অরাজকতা। অরাজকতা দূর করার জন্য জনগণ গোপাল নামে একজন ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করেন। গোপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তার অহিংস আদর্শের কারণে বাংলায় শান্তি ফিরে আসে। পাল রাজারা প্রায় চারশত বছর রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের অবসানের পর সেন রাজবংশের রাজত্ব শুরু হয়।

সেন রাজারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে ক্ষত্রিয় পরিচয়ে অভিষিক্ত হন। সেন রাজত্বের সূচনা করেন সামন্ত সেন। এরপর হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন দেশ শাসন করেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার সভাকবি ছিলেন। জয়দেব বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। তার রচিত 'গীত গোবিন্দ' কালজয়ী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। বখতিয়ার খলজীর অতর্কিত আক্রমণে লক্ষ্মণ সেন পরাজিত হন এবং রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর সেন রাজারা ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাজধানী গড়ে তোলেন এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দী রাজত্ব করেন। আনুমানিক ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সেন বংশের অবসান ঘটে।

শত শত বছর ধরে প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু বাঙালিরা কখনোই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়নি। এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরও হিন্দুযাজক শ্রেণীর অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। তারা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা করত। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ মানা ছাড়া নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের জন্য অন্য কোনো উপায় ছিল না। কারণ তাদের আচার-অনুষ্ঠান পালনে ব্রাহ্মণদের উপস্থিতি ছিল একান্ত জরুরি।

চৌদ্দ শতকে পাঠান সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত 'সুবাহ বাংলা' বা বাংলা প্রদেশ সম্পূর্ণ পদানত করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ইতিহাসে 'শাহী বাঙ্গালা' খেতাবে ভূষিত হন। সুলতানরা এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মূলত শাহী

সুলতানদের আমলেই বাংলায় ধর্ম ও ভাব বিপ্লবের সূচনা হয়। চৈতন্য দেব প্রচার করেন আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ। অন্যদিকে মুসলমান সুফি সাধকদের দ্বারা প্রচারিত মানবতাবাদী মরমিয়াবাদ এক অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি করে।

সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মহাভারত' ও 'ভগবতগীতা' সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়। মুগল আমলে ফার্সি ভাষা গ্রাম-গঞ্জে প্রসারিত হয়। তাদের নতুন রাজস্বনীতি শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। স্থানীয় মানুষ কানুনগো, পাটোয়ারী ইত্যাদি পদে চাকুরি পায়।

প্রাচীন যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন-উত্তরবঙ্গ 'বরেন্দ্র', পশ্চিমবঙ্গ 'রাঢ়' এবং পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ সর্ব প্রথম বাংলাদেশ একক নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং দেশের নাম রাখেন 'বাঙ্গালা'। সুলতানরা ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা, আইন প্রণেতা ও বিচারক। তারা রাজ কর্মচারীদের নিয়োগ দান করতেন। যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। রাজ্য জয় করতেন। বিচারকদের নিয়োগ দান করতেন। সুলতানদের পরে ছিল উজিরদের স্থান। তারা সুলতানদের হয়ে দেশ শাসন করতেন এবং রাজস্ব আদায় করতেন। সুলতানী আমলে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপলাই, বিজয়গুপ্ত, শ্রীকর নন্দী, দ্বিজ শ্রীধর ও শাহ মোহাম্মদ সগীর নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী আসন দখল করেন।

সুলতানদের আমলে বাংলা সাহিত্য রাজ দরবারে প্রবেশ করে। তারা হিন্দু কবিদের বাংলা সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দেন। তাদের উৎসাহে মুসলমানরাও বাংলা ভাষায় কাব্য চর্চা শুরু করেন। সুলতানী আমলে একমাত্র মুসলিম কবি ছিলেন শাহ মুহাম্মদ সগীর।

মুসলমান সুলতানদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল স্থাপত্য শিল্প। তারা এদেশে মসজিদ, সমাধি ভবন, মাদ্রাসা ও ব্রিজ নির্মাণ শুরু করেন। মুসলমান ছেলে-মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতেন মসজিদে। মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল কম। তা সত্ত্বেও সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা চলত। হিন্দু আমলে দালানের গায়ে ছিল দেব-দেবী ও মানুষের ছবি। ইসলাম ধর্মে মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ থাকায় তার স্থান দখল করে জ্যামিতিক নকশা ও লতা-পাতা। মুসলিম আমলের অন্যতম কীর্তি হচ্ছে, নতুন ধরনের খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ।

সুলতানী আমলে মুসলমানদের আগমনের ফলে পোষাক-পরিচ্ছেদ, আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। সিলেটে হযরত শাহজালাল, খুলনা ও যশোরে খান জাহান আলী এবং সোনারগাঁয়ে আবু তাওয়ামার প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। মানুষ বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্তি

পাবার জন্য দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সুলতান বরবক শাহের (১৪৫৯-৭৪ খ্রি.) আমলে যশোরাজ খান রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'। হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) আমলে মালাধর বসু 'ভগবতগীতা' বাংলায় অনুবাদ করেন।

সুলতানী আমলে বাংলা ছিল সমৃদ্ধশালী দেশ। তখন এদেশে আমদানি করা হতো স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মূল্যবান মণি-মুক্তা। তখনকার রফতানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল ধান, কাপড়, আফিম, নীল ও মিহি শাড়ি। আমদানি পণ্যের মধ্যে ছিল ঘোড়া ও বিলাস সামগ্রী। বাংলাদেশ তখন তুলা, আদা ও চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এককথায়, তখন এদেশে ছিল প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা। মহিলারা পরতেন সুতো, সিল্ক ও কারুকাজ খচিত শাড়ি, গলায় স্বর্ণের হার, আঙুলে আংটি, হাতে বালা ইত্যাদি। গৃহস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত হতো স্বর্ণ খচিত তৈজসপত্র, মাটির পাত্র, চিত্রিত থালা-বাসন। সে সময় গাছের ছাল থেকে উৎপাদিত হতো মসৃণ কাগজ। নির্মিত হতো সমুদ্রগামী জাহাজ।

বাংলার সুলতানরা এদেশে থেকে যান। ফলে দেশের সম্পদ দেশে থেকে যায়। মোগল আমলে বাংলার সম্পদ চলে যায় দিল্লিতে। মোগল সম্রাটরা এদেশে থাকার চিন্তাতো দূরের কথা, সাময়িকভাবে বসবাসের চিন্তাও করেননি। মোগল সুবাদার এবং পদস্থ কর্মকর্তারা কেউ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি। এ কারণে সুলতানী আমলের চেয়ে মোগল আমলে অনেক কম স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায়। মোগল আমলের সাহিত্যে ব্যাপকভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে বৈষ্ণব পদাবলী। সহস্রাধিক কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে সংগীত রচনা করেন।

সুলতান হুসেন শাহের আমলে পর্তুগিজরা প্রথম বাংলাদেশে আসে। মোগল আমলে তাদের প্রভাব আরো ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। সে আমলে পর্তুগিজ ভাষা অনেকে বুঝত। পর্তুগজিদের পরে এদেশে আসে ইংরেজ, ডাচ, দিনেমার এবং সবশেষে ফরাসি। এর ফলে বাংলা ভাষায় অনেকগুলো ডাচ ও ফরাসি ভাষা প্রবেশ করে। ইংরেজ রাজত্বের আগে কোনো ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেনি।

মোগল আমলে মুসলমান-হিন্দু সকলেই ফার্সি ভাষা চর্চা করত। এর ফলে আড়াই হাজার ফার্সি এবং ফার্সি উচ্চারণে আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে।

মোগল শাসকরা ছিলেন সুপণ্ডিত এবং শিল্পানুরাগী। তাদের আমীর-উমরারা প্রায় সকলেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। মোগল আমলে শেখ সাদীর লিখিত

প্রবন্ধগুলো সমাজে সমাদৃত ছিল। কাসিম খান, শাহ সুজা, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান ও মুর্শিদ কুলি খান ফার্সি ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের আমলে ফার্সির অনুকরণে বাংলা ভাষায় গজল ও বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়। বাউল গানের সৃষ্টি হয় মোগল আমলে।

মুসলমান আমলের প্রথম থেকে বাংলা বিদ্রোহী প্রদেশ হিসাবে পরিচিত ছিল। দিল্লীর সুলতানরা বাংলাকে ছোট ছোট প্রদেশে পরিণত করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। মোগল সম্রাটরা সুবাদার নিয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন এবং তাতে সফল হন। বাংলার কোনো সুবাদার দিল্লির সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি।

মোগল আমলে বাংলা কাব্যে ধর্মীয় সাহিত্যের পাশাপাশি মানব-মানবীর প্রেমভিত্তিক সাহিত্যের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। সুলতানী আমলে বাংলাদেশে যে ইসলামি দর্শনের সূচনা ঘটে, মোগল আমলে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এককথায়, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদের স্পর্শে এদেশে বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে নীরব বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ বিপ্লব বাংলার রৌরব নরককে উদ্যানে পরিণত করে। কবি চণ্ডিদাসের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

মধ্যযুগে এদেশের মানুষের মনে যে ভাব বিপ্লব সাধিত হয়, সে ভাব বিপ্লবই তাদেরকে মানব মুক্তির শাশ্বত জয়গানে উদ্দীপ্ত করে। জনগণের মধ্য থেকে জন্ম নেয় ঈশা খাঁর মতো কালজয়ী বীর। মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ দুই জন ব্যক্তিকে ধ্বংস করতে পারেননি। তাদের মধ্যে একজন চিতোরের রানা প্রতাপ সিংহ এবং অপর জন বাংলার বীর ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁর ভাটিরাজ্য উত্তরবঙ্গ থেকে ত্রিপুরার সরাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঢাকা জেলার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল এবং দুলাই-নদী ও লক্ষ্মা নদীর সংগম স্থলে অবস্থিত খিজিরপুর দুর্গ ছিল তার প্রধান শক্তির কেন্দ্র। তার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। খিজিরপুরের বিপরীত দিকে লক্ষ্মা নদীর তীরে কাতরাবু নামক স্থানে ছিল ঈসা খাঁর বাসস্থান। এভাবেই বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে প্রেমবাদ, সুফিবাদ ও বীরত্বগাঁথার বহুমাত্রিক দর্শন। বাঙালিরা দুর্জ্ঞেয়কে জানবার মানসে সৃষ্টি করে নতুন নতুন মতবাদ। যেমন-বেদ-বেদান্ত, ভক্তিবাদ, সুফিবাদ, প্রেমবাদ। বাঙালি বাউলরা জন্ম দেয় দেহতত্ত্ববাদ। তারা খাঁচার ভেতর অচিন পাখির চিন্তায় আত্মনিমগ্ন হয় ।

মুসলমান শাসকদের আগমনের আগে বাংলা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এ তিনটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক এককের নাম ছিল লক্ষণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ প্রথম তিনটি একককে একত্রিত করে

'বাঙ্গালা' বা 'বাংলা' নামের প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। তার সৈন্যবাহিনীকে বলা হতো 'বাঙ্গালার শক্তি' বা 'বল'। ইতিহাসবিদ আবদুল করিম এটা প্রমাণ করেন যে, প্রথম দিকে মুসলমানদের নৌ শক্তি ছিল না। অশ্ব ছিল তাদের যুদ্ধের প্রধান বাহন। তাই প্রথম দিকে তাদের বিজয় বরেন্দ্র এবং বাঢ়ের উত্তর এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে তারা নৌ বাহিনী গঠন করে। প্রায় দেড়শত বছরের মধ্যে তারা সমগ্র বাংলাকে করতলগত করে।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ। এর সময়কাল ধরা হয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এরপর স্বাধীন সুলতানী আমল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। চর্যাপদ রচনা করে বৌদ্ধ সহজিয়ারা। তারা বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাস করতেন না। তাই তাদের কাছে বাংলা ভাষা চর্চা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত ভাষায় কাব্য চর্চা করতেন। সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের ভাষা ছিল সংস্কৃত। তা একান্তভাবেই ব্রাহ্মণদের ভাষা। এ কারণেই শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা দেবভাষা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেননি। তারা মনে করতেন অন্য কোনো ভাষায় কাব্য রচনা করা ধর্মবিরোধী কাজ। তাছাড়া হিন্দু আমলে অফিস-আদালতের ভাষা ছিল সংস্কৃত। রাষ্ট্রের উচ্চাসনে বাংলা ভাষার মর্যাদা না থাকায় তার শক্তি কিছুটা হলেও নিঃশেষ হয়। তবে প্রাকৃতজনের ভাষা হিসাবে বাংলা টিকেছিল।

মুসলমানদের আগমনের পর ফার্সি ছিল রাষ্ট্র ভাষা। এ ভাষা শেখার অধিকার সকলেরই ছিল। ফলে নিচু স্তরের মানুষও তাদের সামাজিক উত্তরণের পথ খুঁজে পায়। মুসলমান শাসকরা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

এদেশে মুসলমানরা আসার প হিন্দুরা ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বর্ণবৈষম্য ধর্মান্তরের প্রধান রণ। কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। উত্তর-ভারতে বর্ণবৈষম্য অনেক কঠোর ছিল। কিন্তু সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়নি। বাংলাদেশের মানুষের মানস গঠনে বৌদ্ধ ধর্মের সহনশীলতা ধর্মান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেন আমলে তা আঘাত পায়। ফলে সহনশীলতার সঙ্গে বর্ণবৈষম্যের সংঘাত ঘটে। এ অবস্থায় ইসলাম ধর্মের সম্প্রীতির মনোভাব ধর্মান্তরের প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া বাংলায় আর্য প্রভাবের সৃষ্টি হয় অনেক পরে। এর প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঢ় অঞ্চলে। ভাটি অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে তা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেনি। এ কারণে দুই অঞ্চলে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সত্তা ভিন্ন ছিল। বাংলায় ইসলামের যে রূপ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে 'ফোক-ইসলাম'।

মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ আদিবাসীরা একই মাঠে হাল চাষ করেছে, একই হাটে গেছে, একই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করেছে, একই পানিতে গোসল করেছে, একই ধরনের ফসল উৎপাদন করেছে, একই ধরনের কারুপণ্য উৎপাদন করেছে। ফলে দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম তাদের কাছে জীবন চলার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সন্নাসী, সাধক, সুফি, দরবেশ ও বাউল দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে বাঙালি মূল্যবোধের সঙ্গে।

মুসলমান আমলের সাহিত্যের বড় উপাদান হচ্ছে প্রেমবাদ এবং অধ্যাত্মবাদ। এর ফলে সমাজ একটি বিন্যাসে সংগঠিত হয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ দোষে-গুণে মানুষে পরিণত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের মানুষ শাস্ত্রের বাঁধনে বাঁধা পড়েনি। এখানে প্রেম পাথরের নিচে চাপা পড়ে পিষ্ট হয়নি। বাংলার লোককাহিনীগুলোতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প নেই। নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মাচার ও মৃতের সৎকারে পার্থক্য ছিল। কিন্তু সকল শ্রেণীর মানুষ একই ধরনের তৈজসপত্র ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। একই ধরনের মেলা উদযাপন করত। একরকম খেলায় অংশ নিত। বাংলাভাষী মানুষ একই ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। তারা ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, গম্ভীরা, বাউল, মুর্শিদী, মারফতী প্রভৃতি গান একই সঙ্গে উপভোগ করত।

স্বাধীন সুলতানী আমলেই শ্রীচৈতন্যের মতো ধর্ম সংস্কারকের জন্ম হয়। মুসলমান সুফি সাধকরা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত প্রেম-ভক্তিবাদী লোকধর্ম প্রচার করেন। কৃত্রিম বর্ণবৈষম্য বর্জিত লোকধর্ম সাধারণ মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করে।

সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে শিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে। এ সময় কবিতায় লোকজ উপাদান যোগ হয়। মোগল আমলে বাঙালি মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার সুযোগ পায়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন আলাওল, দৌলত কাজী, সাবিরিদ খান, সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খান প্রমুখ। ইসলাম ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাবের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভারতবর্ষের হিন্দু মহাপুরুষরা ধর্ম সংস্কারের দিকে মন দেন। শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বাঙালিদের মনে ভাব বিপ্লবের সূচনা করে। মধ্যযুগের ভাব বিপ্লবীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। হিন্দু আমলে বাংলা ছিল খণ্ড-বিখণ্ড। তুর্কী শাসনামলে আকবরের সময়

এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-৮২) বলেন, "যে 'বাংলা-দেশ' বলিতে আমরা নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করি, তাহার সৃষ্টির কৃতিত্ব মুসলমানদেরই প্রাপ্য।"

মুসলমানদের দেশ শাসন চলে প্রায় ছয়শ' বছর। বাংলাদেশের জন্য এ সময়ের ঘটনা প্রবাহ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পণ্ডিতদের মতে শাহ মুহম্মদ সগীরই আদি বাঙালি মুসলমান কবি। তিনি তার কাব্য 'ইউসুফ-জুলেখা' রচনা করেন গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯) রাজত্বকালে। মধ্যযুগের শেষ চারশত বছরে বাংলা ভাষার মুসলমান কবিরা ব্যাপক অবদান রাখে। কিন্তু তা হিন্দু কবিদের সমতুল্য নয়। এর কারণ মুসলমান শাসকরা ছিলেন অবাঙালি ও বহিরাগত। সমাজের নিচের স্তরের মুসলমানরা ছিল নিরক্ষর। তারা ধর্মান্তরিত হয় নিচের স্তরের হিন্দু ও বৌদ্ধ থেকে। ফলে তখন তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চার মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি মুসলমান কবিরা সাহিত্য চর্চা করেন। অন্যদিকে হিন্দু কবিরাও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পান। মুসলমান ও হিন্দু কবিদের মিলিত প্রয়াসে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সকল স্তরের মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছে। একটি শিক্ষিত ও রুচিবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

মুসলমান আমলে সরকার কিংবা বিত্তবান মানুষেরা শিক্ষক, সুফি, দরবেশ, ব্রাহ্মণ, সন্নাসী এবং অন্যান্য জ্ঞানী-গুণী মানুষকে নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ লাখেরাজ ভূমি দান করতেন। এ সব সম্পত্তি দানের উদ্দেশ্য ছিল তাদের ভরণ-পোষণ। এমনকি মসজিদ, মন্দির, দরগা নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাখেরাজ ভূমি দান করা হতো। লাখেরাজ সম্পত্তি যারা লাভ করতেন, তাদের অবস্থা জমিদারদের চেয়েও ভালো ছিল। তারা অভিজাত ব্যক্তি হিসাবেও সম্মান লাভ করতেন। জমিদারদেরকে নিজেদের জমির জন্য খাজনা দিতে হতো। কিন্তু লাখেরাজ সম্পত্তির মালিকদের খাজনা দিতে হতো না।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সর্ব প্রথম লাখেরাজ সম্পত্তি বাতিলের উদ্যোগ নেন। তখন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী শক্তিশালী থাকায় তার উদ্যোগ কার্যকর হয়নি। ১৮২৮ সালে কোম্পানি সরকার লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত শুরু করে। এসব সম্পত্তি খাস জমিতে পরিণত হয়। কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। এতে মুসলমান পরিবারগুলো যেমন ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর মুসলমানদের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় রাজভাষা ফার্সি এবং বিচার বিভাগের চাকুরি।

ইংরেজরা ভারতের শাসনভার হাতে নিলেও বেশ কয়েক দশক রাজভাষা হিসাবে ফার্সি চালু ছিল। আদালতের ভাষা ছিল ফার্সি। এ কারণে বিচার বিভাগে মুসলমানদের আধিপত্য বজায় ছিল। আলেম, মুফতি ও কাজিরা ছিলেন মুসলমান। প্রথমদিকে ইংরেজরা কলকাতা মাদ্রাসার সার্টিফিকেট ছাড়া বিচার বিভাগে চাকুরি দিত না। ১৮৩৩ সালে লর্ড বেন্টিক ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে চালু করেন। এর ফলে মুসলমানরা সর্বশান্ত হয়ে যায়। তখন ফার্সি জানা মুসলমানরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তারা চাকুরি হারাতে থাকে।

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংরেজি না জানা ব্যক্তিদের জন্য সরকারি চাকুরি নিষিদ্ধ করার আইন পাস করেন। এর ফলে মুসলমানরা কার্যক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হয়। কারণ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। হিন্দুরা আগে থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে তারা সরকারি অফিস আদালতে ঢুকতে থাকে।

ইংরেজরা একের পর এক মুসলমান উৎখাতের আইন পাস করার কারণে তারা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এসব আইনের মধ্যে রয়েছে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইন (১৮২৮), শিক্ষা সংক্রান্ত আইন (১৮৩৫), রাজভাষা পরিবর্তনের আইন (১৮৩৭), ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ আইন (১৮৪৪) ইত্যাদি। এসব আইন পাস করার ফলে মুসলমানরা নিরক্ষর ও নিঃস্ব জাতিতে পরিণত হয়। তারা সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয়। এমনকি মুসলমান কৃষক ও কারিগররা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একে একে ধ্বংস হয়ে যায়। এ সময়েই মীর নিসার আলী তীতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহীদ হন।

মুসলমানদেরকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে রক্ষা করার জন্য হাজী শরিয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলন ছিল মূলত একটি ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে একত্রিত করা। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরা এ আন্দোলনে যোগ দেয়। শিক্ষিত আলেমদের নেতৃত্বে সংগঠিত ফরায়েজি আন্দোলনের কর্মীদের আক্রমণে হিন্দু জমিদাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ফারায়েজি আন্দোলনের প্রধান নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮৪০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাধক, সৎ এবং কুসংস্কার মুক্ত। তার মৃত্যুর পর তার একমাত্র পুত্র মোহসেন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া পিতার

স্থলাভিষিক্ত হন। দুদু মিয়া জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমুদয় জমির মালিক আল্লাহ। জমির উপর খাজনা দাবি করার অধিকার কারো নেই। তার এ দাবি জমিদার, নীলকর সাহেব এবং ইংরেজ সরকারকে তটস্থ করে তোলে। তার মৃত্যুর পর ফারায়েজি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ স্তিমিত হয়নি। ফারায়েজি আন্দোলনের পর সংঘটিত হয় নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯০৬১), পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩) এবং তুষাখালীর কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৮-৭৫)।

ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে বাঙালি মুসলমানরা ছিল পরমত-সহিষ্ণু। উনিশ শতকে তীতুমীর ও শরিয়তুল্লাহর ইসলামী আন্দোলন মুসলমানদের যেমন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি মুসলমানরা ফকির লালন শাহের (১৭৭৪-১৮৯০) সমন্বয়বাদী মানবতাবাদকে সহজে গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। হিন্দু বাঙালি মনিষীদের প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুসলিম সম্রাটদের কুৎসা রটনা এবং ইংরেজ শাসকদের মহিমা কীর্তন করা। রাজা রামমোহন রায় উদার মনোভাবের মনিষী ছিলেন। কিন্তু তিনি ভগবানকে এ বলে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুদের মুক্ত করার জন্য ইংরেজদের প্রেরণ করেছেন। ইংরেজরা মুসলমানদের নিঃস্ব করার কারণেই মুসলমানরা ওহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলন শুরু করে। ইসলামের গন্ধ আছে বলে হিন্দুরা ওহাবি আন্দোলন সমর্থন করেনি। কিন্তু উভয় সম্প্রদায় সিপাহী বিপ্লবে অংশ নেয়। ভারতের শিখরা সিপাহী বিপ্লবে অংশ না নিয়ে ইংরেজদের পক্ষ নেয়। তাদের সাহায্যেই ইংরেজরা 'দিল্লি নগর' পুনরুদ্ধার করে।

ধর্মে ধর্মে বিরোধের বীজ বপন করে ইংরেজরা প্রায় পৌনে দুইশত বছর উপমহাদেশ শাসন করে। তাদের হাতেই উপমহাদেশ খণ্ডিত হয়ে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয়। পাকিস্তান আমলে বঙ্গপোসাগর ছাড়া আর কোনোখানে 'বঙ্গ' নামের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা ছিল। মুসলমান ও হিন্দুরা মিলেই বাংলা ভাষার নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। অষ্ট্রিক, তিব্বত, পাঠান, মোগল, পর্তুগিজ, তুর্কী, আর্য-অনার্য বহু জাতির সংমিশ্রণে এদেশের জনসৌধ গড়ে উঠেছে। বহু শতাব্দী ধরে এ সংমিশন ঘটেছে। এদেশে পাঠানরা রয়ে গেছে, ইংরেজরা থাকেনি। ইংরেজদের মতো পাকিস্তানীরাও চলে গেছে।

মুসলমান শাসকদের আমলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষা পায় নতুন চিন্তার আলো। ফার্সি ও ইংরেজি সাধারণ মানুষের

মুখের ভাষা ছিল না। ছিল শিক্ষা গ্রহণের ভাষা। বাংলা ছিল সাধারণ মানুষের কাজের ভাষা।

মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর জীবন ছিল নগরকেন্দ্রিক। অথচ বঙ্গদেশে নগরের সংখ্যা ছিল কম। এ কারণেই মুর্শিদাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের পতন হয়। ইংরেজরা মুসলমানদের রাজ্যহারা করে। স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের ক্ষোভ ছিল বেশি। ইংরেজি ভাষার প্রতি তারা ছিল ক্ষুব্ধ। প্রায় পাঁচ-ছয় দশক এ ক্ষোভ অব্যাহত ছিল। এর ফলে সাধারণ মুসলমানরা একটি নিরক্ষর জাতিতে পরিণত হয়। তাদের জন্য পিয়ন, চাপরাসী, খানসামা ছাড়া তেমন কোনো কাজ ছিল না। মুসলমানরা নিজস্ব উদ্যোগে করত চাষাবাদ, কাপড় বয়ন ও দোকানদারি ইত্যাদি। একইভাবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ছিল ছুতার, কামার, কুমার, গোয়ালা, নাপিত ইত্যাদি।

ইংরেজদের সহযোগিতায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয় বুদ্ধিজীবী, জমিদার, জোতদার ও মহাজন। হিন্দু ব্রাহ্মণরা জমিদার হিসাবে মুসলমানদের শোষণ করত। আর মহাজন হিসাবে আদায় করত চড়া সুদ। এ কারণেই পশ্চিম বাংলার চেয়ে পূর্ববঙ্গে বেশি কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র কৃষকদের বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়ে অসচ্ছল অবস্থায় ছিলেন। আর পূর্ববঙ্গের কৃষকরা তাদের তুলনায় অধিক পাট চাষ করে স্বচ্ছল হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকে মুসলমান ও হিন্দু মিলিত প্রয়াসে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ দানা বাঁধে। এ দুটি আদর্শের স্ফুরণ ঘটে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ফলে। জাতীয়তাবাদের প্রথম স্ফূরণ ঘটে ইতালিতে। এর প্রথম রূপকার ছিলেন ম্যাকিয়াভেলী। এ আদর্শ স্ফুরণের মূলে ছিল ইতালিকে একীভূত করার প্রয়াস। আর ভারতে এর উন্মেষ ঘটে ঊনবিংশ শতকে।

হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা তা মেনে নেয়নি। এর ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আদর্শের সংঘাত সৃষ্টি হয়। অনেক সময় তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ লাভ করে। এর রেশ বেশি দিন থাকেনি। কারণ, নগরকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে সাধারণ মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করেনি। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির মূল প্রেরণাই ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানবিক দর্শন।

চীনের স্বাতন্ত্র্য

চীনের সমাজ ব্যবস্থা কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। এর মধ্য দিয়ে সেখানে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো। চীনের দীর্ঘ ইতিহাস জন্ম দিয়েছে অনেক রাজবংশ, সমরকুশলী, মুক্তির মহান সৈনিক, সমাজ বিজ্ঞানী, ধর্মপ্রচারক, কবি ও দার্শনিক। চীনা জনগণ নিজেদের সংস্কৃতিকে অনেক উঁচু স্তরে নিয়ে গিয়েছে। তাদের সুদক্ষ কৃষি ব্যবস্থা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বচ্ছল জীবনের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। প্রাচীন সভ্যতা নির্মাণে তারা ইউরোপের চেয়ে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে ছিল। তাদের কাছ থেকে মানব সভ্যতা উপহার পেয়েছে কাগজ, রেশম, বারুদ, দিক নির্দেশক কম্পাস, ছাপাখানা ও চীনামাটির পাত্র। তারা যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করেছে ধনুক ও কামান।

রোমান ভাষায় চীনের নাম ছিল 'সেরিকা' অর্থাৎ রেশমের দেশ। চীনের উৎপাদন দক্ষতা পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রায় দুই হাজার বছর এগিয়ে ছিল। আধুনিক যুগের শুরুতে চীন সহসাই অনগ্রসর জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়। এরপরও চীনের রাজারা নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বিসর্জন দেননি। ১৭৯৬ সালে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ চীনের সঙ্গে অধিক বাণিজ্যের প্রস্তাব দেন। চীনের সম্রাট ছিয়ান লং এর উত্তরে লেখেন, 'আমাদের সবকিছু আছে। আমাদের কাছে অদ্ভূত কিংবা আজগুবি জিনিসের মূল্য নেই। আমাদের দেশে আপনার দেশের কোনো উৎপাদকের কোনো প্রয়োজন নেই।'

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সামরিক শক্তির জন্ম দিয়েছে, সেই শক্তি অর্জনের মোহ চীনের ছিল না। তখন চীনারা নিজেদের গৌরবময় অতীত নিয়ে আত্মরক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। তখন চীনের জনগণ শোষকদের বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে দেশাত্মবোধক লড়াইয়ে নিয়োজিত। তাদের সেই লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজবংশের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ। এসব লড়াইয়ের মাধ্যমে চীনের জনগণ নিজেদের বীরত্বগাঁথা এবং ত্যাগের মহিমা তুলে ধরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের অসীম আগ্রহের কারণে।

বিশ্বের যে কোনো জাতির চেয়েই তারা স্বতন্ত্র। কারণ নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তোলার মহৎ প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সব সময়েই ছিল। অনেকেরই ধারণা জার্মানির মেনজ নামক স্থানে গুটেনবার্গ পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু নৃ-তাত্ত্বিক জে, ম্যানচিপ হোয়াইট তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, ১৪৫০ সালের চারশ বছর আগে চীনে ছাপার কাজ হতো। ইউরোপে কাগজ তৈরির এক হাজার বছর আগে চীন কাগজ তৈরি করেছে। জাপান তার সংস্কৃতির অনেক কিছুই চীনের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। প্রায় হাজার বছর আগে গ্রহণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর গতি ছিল একমুখী। লিপি, লোহার কাজ, ধাতব মুদ্রা, বৌদ্ধ ধর্ম, টাইপ মুদ্রণ প্রভৃতি প্রথমে চীনে পরিবর্তিত হয়। পাঁচশ থেকে দু হাজার বছরের মধ্যে তা জাপানে যায়। কিন্তু অহঙ্কারী চীন গুটানোপাখা ছাড়া জাপানিদের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করেনি।

চীন থেকে নতুন নতুন প্রযুক্তি, ধর্ম ও দর্শন গ্রহণ করার পাশাপাশি জাপান নিজস্ব সনাতনী সংস্কৃতির ধারাও অটুট রেখেছে। জাপানিরা কনফুসিয়াস ধর্ম গ্রহণ করেনি। শিন্টো ধর্ম আঁকড়ে থেকেছে। তারা চৈনিক আমলাতন্ত্র বর্জন করেছে। নিজেদের ধর্মভিত্তিক আভিজাত্য বজায় রেখেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাপান পাশ্চাত্যের সামনে দ্বিতীয়বারের সংস্কৃতির দ্বার খুলে দেয়। আর তখনো চীন নিজেদের সাংস্কৃতির আভিজাত্য বজায় রাখে।

আদিমকালে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে ধাতব মুদ্রা চালু ছিল না। পৃথিবীতে প্রথম ধাতব মুদ্রার প্রচলন করেন পারস্যের অধিপতি প্রথম দানিয়ুম (৫২২ খ্রি: পূ-৪৮৫ খ্রি: পূ:)। প্রথম ধাতব মুদ্রার নাম শেকেল। আলেকজান্ডারের বিজয়াভিযানকালে চীন ও ভারতবর্ষে ধাতব মুদ্রার প্রচলন হয়। এর আগে চীন ও ভারতের বিনিময় মাধ্যম ছিল কোদাল ও ছুরি। চীনারা

প্রথম কাগজের টাকার প্রচলন করে। ইউরোপ চা পানের অভ্যাস চীনের কাছ থেকে শেখে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন দেশের ইয়াংসি নদীর অববাহিকতায় চায়ের আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এরপর অষ্টাদশ শতকে চা পানের অভ্যাস ইউরোপে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। চায়ের সুগন্ধ এবং মৃদু উত্তেজক ভাব চা-কে জনপ্রিয় করে তোলে।

অন্যান্য সভ্য জাতির তুলনায় চীন ও ভারত ধান চাষে অগ্রসর ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ধান চাষের সূত্রপাত হয় চীন অথবা ভারতে। পরে তা এশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপে মুরগণ সর্বপ্রথম ধান চাষ শুরু করে। এরপর ধান চাষ শুরু হয় ইতালি ও তুরস্কে।

বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। এক্ষেত্রে চীনের হোয়াংহো এবং ইয়াংজেকিয়াং নদী দুটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। চীনের নদীগুলো পশ্চিমে উচ্চভূমি থেকে সৃষ্টি হয়ে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হয়েছে। হোয়াংহো নদীর দুই তীরে বিস্তীর্ণ পলল ভূমির তটে জমা হয়েছে উঁচু বালির স্তূপ। পাললিক ভূমিতে চাষ হতো নানা রকম ফসল। এসব ফসলের মধ্যে ছিল জোয়ার, গম, ধান ও সব্জী।

হোয়াংহো নদীর তীরের মানুষ পশু পালন করত। রেশম কীটের চাষ করত। রেশমের সুতো দিয়ে বয়ন করত মজবুত কাপড়। হোয়াংহো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। কবরের মধ্যে ক্ষৌম্য বস্ত্রে আবৃত মৃতদেহ ও খাদ্যশস্যসহ হাঁড়ি পাওয়া গিয়েছে। বর্ষার সময় হোয়াংহো নদীর দু কূলের বন্যায় ফসল ভেসে যেত। এ জন্য হোয়াংহো নদীকে বলা হতো চীনের দুঃখ। দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে যেত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম নদী ইয়াংজেকিয়াং। এর তীরবর্তী অঞ্চলের উর্বরতা ও পরিমিত বৃষ্টিপাত চীনের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

চীনের আদি জনগোষ্ঠীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে কিংবদন্তির আশ্রয় নিতে হয়। চীনের অস্তিত্বের সঙ্গে ড্রাগনের রূপকল্পটি গভীরভাবে জড়িত। চীনারা বিশ্বাস করে, যখন পৃথিবী তৈরি হয়নি, তখন সবকিছুই ছিল এলোমেলো এবং প্রলয়য়ের মুখোমুখি। এর মধ্যেই 'ইয়াং' এবং 'ইন' শক্তি দুটোকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে সমস্ত সৃষ্টি। চীনাদের বিশ্বাস মতে, 'ইয়াং' হচ্ছে পুরুষসত্তা এবং 'ইন' হচ্ছে নারীসত্তা। পুরুষসত্তা হচ্ছে ঔজ্জ্বল্য, উষ্ণতা ও কর্মক্ষমতার উৎস। নারীসত্তা হচ্ছে অন্ধকার, শীতলতা ও কোমলতার উৎস। এ দুটি সত্তা মিলে জন্ম দেয় 'পানকু' নামের এক মানব। 'পানকু'-ই রূপ নেয় পৃথিবীতে।

'পানকু'র মাথা থেকে বের হয় পর্বত, নিঃশ্বাস থেকে মেঘ, কণ্ঠস্বর থেকে বজ্র, গায়ের শিরা উপশিরা থেকে সৃষ্টি হয় নদ-নদীর। 'পানকু'র চুল আর গায়ের পশম থেকে সৃষ্টি হয় গাছপালা। তার গায়ের উপর কিলবিল করে বেড়ায় পোকামাকড় অর্থাৎ মানুষ আর পশু-পাখি। মাটির নিচের বিভিন্ন খনি হচ্ছে 'পানকু'র দাঁত আর হাড়। 'পানকু'র ছিল তিন সহকারী-ড্রাগন, ফিনিক্স পাখি আর প্রকাণ্ড কচ্ছপ। ফিনিক্স আর কচ্ছপ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। শক্তির আধার হয়ে বেঁচে থাকে ড্রাগন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ডা. সানইয়াৎসেনের নেতৃত্বে চীনে বিপ্লব সংঘটিত হবার আগে চীনা জাতীয় পতাকায় ড্রাগনের চিত্র ছিল।

অনুমান করা হয় পুরোপলীয় যুগ থেকে চীনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। তবে চীনের পুরোপলীয় যুগের যথেষ্ট দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়নি। নবোপলীয় যুগের মানুষের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পুরোপলীয় যুগের শেষদিকে এ অঞ্চলে ছিল বরফের আস্তরণ। নবোপলীয় যুগে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকে। ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হোয়াংহো নদীর তীরে গড়ে উঠেছে চীনের ইয়াং শো সংস্কৃতি। সে সময় মানুষ পালন করত কুকুর ও শূকর। একই সময় ইয়াং শো সংস্কৃতির উত্তরে গড়ে উঠেছে লাং শান সংস্কৃতি।

শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে প্রায় তিরিশ হাজার বছর আগে। 'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষ চিত্রকলার মাধ্যমে ধরে রেখেছে তাদের চারপাশের দৃশ্য। তারা এঁকেছে বাঁকানো শিঙওয়ালা হরিণ, রক্তাক্ত ভাল্লুক এবং শিকারির হাতে ক্ষত-বিক্ষত বাইসনের চিত্র। শিকারজীবী মানুষ পশুর পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে নৃত্যকলা। কোনো কোনো গুহার চিত্রে দেখা গিয়েছে অঙ্কনরত মানুষের ছবি। শিকারে বের হবার আগে মানুষ প্রথমে পশুর ছবি আঁকত এবং সেই ছবিকে হত্যা করত। এভাবেই তারা পশুর উপর সম্মোহন প্রভাব বিস্তার করত। এ থেকে উদ্ভব হয়েছে যাদুবিদ্যার। তারা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখত এবং স্বপ্নের মধ্যে দেখত নিজেদের মৃত্যু কিংবা লড়াইয়ের দৃশ্য। এ থেকেই তারা ভাবত দেহের ভেতরে আত্মা আছে। সেই আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে গিয়ে যখন ফিরে না আসে, তখন মৃত্যু হয় মানুষের। এভাবেই মানুষ স্বপ্ন ও আত্মা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তারা আত্মা ও অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। ফলে তাদের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

আদিম মানুষ মৃতদেহকে পশু-পাখির খাদ্য হিসাবে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখত। এর বহু পরে তারা মানুষকে কবর দেয়া শুরু করে। সমাধিস্থ করার সময় মৃতদেহের সঙ্গে দিত খাদ্যবস্তু, শ্রমের হাতিয়ার ও গয়নাগাটি। এভাবেই

মানুষ চিন্তা করতে শিখেছে। তারা আবিষ্কার করেছে নদী ও হ্রদ পার হবার প্রযুক্তি। দু-তিনটি কাঠের গুঁড়ি এক সঙ্গে বেঁধে তৈরি করেছে ভেলা। এরপর গুঁড়ি কেটে নির্মাণ করেছে ডিঙি। স্থাপন করেছে বসতি।

শিকারী মানুষ প্রথমে কুকুরদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করেছে। কুকুর ছিল মানুষের বাসগৃহের প্রহরী ও পথের বান্ধব। এরপর তারা গাছের ডাল বাঁকিয়ে ছিলা পরিয়ে আবিষ্কার করেছে ধনুক এবং ধনুক দিয়ে শিকার করতে শিখেছে দূরের পশু।

মহিলারা খাদ্যশস্য জোগাড় করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে শস্যবীজ থেকে গাছ হয়। এভাবেই সংগৃহবৃত্তি থেকে উদ্ভব হয়েছে কৃষি কাজের। কৃষিকাজের জন্য দরকার হয়েছে কুড়াল, কোদাল ও কাস্তে। মানুষ প্রথমে লাঠির সঙ্গে পাথর বেঁধে তৈরি করেছে কুড়াল। এরপর তারা কুড়ালের প্রান্তদেশ নির্মাণ করেছে হাড় কিংবা শিং দিয়ে। পশুর চোয়ালের সঙ্গে প্রস্তরখণ্ড বেধে নির্মাণ করা হয়েছে কাস্তে।

প্রাগৈতিহাসিককালে কৃষিকাজে শ্রমের প্রধান হাতিয়ার ছিল কোদাল। সংগ্রহবৃত্তি থেকে কৃষিকাজ ভালো ফল দিয়েছে। কিন্তু গোত্রভুক্ত মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়নি। ফলে উন্নততর হাতিয়ারের সন্ধান করতে হয়েছে মানুষকে। এভাবেই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হস্তশিল্প। হাত দিয়ে মানুষ পাথর ঘষে কিংবা ছিদ্র করে গড়ে তুলেছে পাথরের অস্ত্র। কাঁচা মাটি পুড়ে তৈরি করেছে হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, চুলো ইত্যাদি। এরপর মানুষ পশুর লোম, শন ও তুলো দিয়ে কাপড় বোনা শিখেছে।

মানুষ কৃষিকাজ ও হস্তশিল্পের যুগে যৌথভাবে জমিতে ফসল উৎপন্ন করেছে এবং কারুপণ্য তৈরি করেছে। যৌথভাবে কাজ করতে করতে গড়ে উঠেছে পরিবার ও গোত্র। কয়েকটি গোত্র মিলে গঠিত হয়েছে কৌম। কৌমের মানুষ একসঙ্গে কাজ করেছে। আচার-অনুষ্ঠান করেছে। জীবনকে আনন্দময় করে তোলার জন্য আয়োজন করেছে বিভিন্ন উৎসবের।

কৃষিজীবী মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার লাঙল। প্রথমে চাষ করা হতো কোদাল দিয়ে। পরে আবিষ্কৃত হয়েছে লাঙল। লাঙলের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে ষাঁড়। কৃষিকাজে পেশীশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশুশক্তি। এভাবেই মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সভ্যতার যুগে প্রবেশ করেছে।

মানুষের বিবর্তন হতে লেগেছে কোটি কোটি বছর। ১৯২৪ সালে অধ্যাপক রেমন্ড ডার্টের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ আফ্রিকায় চুনাপাথরের খনি থেকে

আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাক-মানুষের দেহাবশেষ। এর নাম দেয়া হয়েছে 'অস্ট্রালোপিথেকাস'। এর কৃন্তক ও ছেদক দাঁত ছিল বনমানুষের মতো। চোয়াল ছোট ও হালকা। বিজ্ঞানীদের অনুমান 'অস্ট্রালোপিথেকাস'-এর বয়স ১০ থেকে ৩৫ লাখ বছর। এরপর বিজ্ঞানীরা আরো উন্নততর প্রাণীর দেহাবশেষ আবিষ্কার করেন। ১৮৯৪ সালে ডাচ উপনিবেশের সামরিক কর্মকর্তা সার্জন ড. উইজেনি দুবিস মানুষ সদৃশ্য কঙ্কালের মাথার খুলির উপরের অংশ, চোয়ালের হাড়ের অংশ, তিনটি দাঁত এবং বাম উরুর হাড় আবিষ্কার করেন। জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা এসব হাড়ের অংশ বিশ্লেষণ করে একটি আদিম মানুষের কঙ্কালের চেহারা দাঁড় করান। তারা এর নাম দেন 'জাভা মানব'। 'জাভা মানব' এক মিলিয়ন বছর আগে বরফযুগের প্রথম পর্যায়ে জীবিত ছিল বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। আবিষ্কৃত জাভা মানবের উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে চীনের পিকিং থেকে সাইত্রিশ মাইল দূরে মাটির নিচে আবিষ্কৃত হয় আদিম মানুষের বিশটিরও বেশি কঙ্কাল। বিজ্ঞানীলা এর নাম দেন 'পিকিং মানব'। তাদের অনুমান পিকিং মানব জাভা মানবের মতো প্রাচীন। তারা এক মিলিয়ন বছর আগে জীবিত ছিল। চীনে প্রাপ্ত মানবের নাম দেয়া হয় 'সিনানথ্রোপাস'। সাধারণভাবে এর পরিচয় 'পিকিং মানব' হিসাবে। 'পিকিং মানব' ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারত এবং আগুন জ্বালাতে জানত। পিকিং মানবের কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে হাড় ও পাথরের তৈরি দুই হাজারেরও বেশি দ্রব্যাদি। প্রাথমিক যুগে মানুষ বসবাস করত বিচ্ছিন্নভাবে এবং তারা বিচিত্র রুচির খাদ্য গ্রহণ করত।

মানুষের সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পুরুষের নেতৃত্বে বিকাশ ঘটেছে পরিবারের। সন্তানরা বড় হলে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। তারা ভিন্ন পরিবার গড়ে তুলত। এসব পরিবার একত্রে গঠন করত ক্ল্যান। ক্ল্যানের সংগঠিত রূপ হচ্ছে ট্রাইব। আদিম মানুষের সংগঠিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর বিশেষ অঞ্চলে বৃহত্তর পরিসরে রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এভাবেই মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক সংগঠন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম, দর্শন, নিয়ম-কানুন, সামাজিক প্রথা, আইন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের চিন্তা-ভাবনার মানসিক ও আধ্যাত্মিক রূপ। কোনো এক জনগোষ্ঠীর উপর অন্য জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে; আবার কখনো বা তা হয়েছে বল প্রয়োগের মাধ্যমে।

ইতিহাসের বিচারে কোনো জাতিই এককভাবে সকল সাংস্কৃতির ধারক নয়। প্রত্যেক জাতিরই একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে। প্রাচীনকালে মিশর, ভারত কিংবা চীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে স্বতন্ত্রভাবে। এর কারণ প্রধানত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক। চীনের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জাতি হিসাবে চীনারা ছিল আত্মপ্রত্যয়ী ও শান্তিবাদী। তাদের নৈতিক দর্শন সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ থেকে তাদেরকে বিরত রেখেছে। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক বাধার কারণে চীনের মূল ভূ-খণ্ড চারপাশের অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। চীনের উত্তর সীমান্তে ছিল গোবি মরুভূমি। পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে ছিল প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে ছিল পৃথিবীর ছাদ হিসাবে পরিচিত তিব্বতের পার্বত্য মালভূমি। এসব প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে চীন একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে তুলেছে। চীনের পাঁচ ভাগের চার ভাগই জুড়ে ছিল পাহাড়, পর্বত এবং মালভূমি। আর বাকি এক ভাগ সমুদ্র এবং নদীর তীরবর্তী সমভূমি। পর্বতসঙ্কুল জীবন তাদেরকে যেমন কষ্ট সহিষ্ণু জাতিতে পরিণত করেছে, অন্যদিকে তেমনি করেছে ঐক্যবদ্ধ।

২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনে সূচিত হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাত্রা। চীনের পৌরাণিক রাজার নাম ছিল হুয়াং তি। চীনের বিভিন্ন জাতি মিলে হুয়াং তি নামক এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করে। তিনি হুয়াংহো নদীর উপত্যকায় নিজের রাজ্য গড়ে তোলেন। তার আরেক নাম ছিল 'পীত সম্রাট'। হুয়াং তির আমলে চীনের মানুষ গুটিপোকার চাষ করত। তারা নৌকা ও মালটানা গাড়ি নির্মাণ করতে জানত। প্রাচীনকালে হোয়াংহো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আবিষ্কৃত হাড়ে কিছু লেখার অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময়ের একটি হাড়ের উপর লেখা ছিল : 'পৃথিবীর বুকে যাতে বৃষ্টি নামে, সে জন্য আমরা দাসকেই পোড়াই।' বৃষ্টি ও বন্যার ভয় থেকে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে অশুভ দেবতার ধারণা। এসব দেবতাদের তুষ্টির জন্য চীনারা বহু দাসকে পুড়িয়ে মারত। কিংবা জীবন্ত কবর দিত। ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু জিনিসের নমুনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, সে সময় চীনে দাসভিত্তিক সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে। দাসভিত্তিক সমাজকে ঘিরেই গঠিত হয়েছে চীন দেশের প্রাচীনতম রাষ্ট্র। হোয়াংহো নদীর তীরের মানুষ সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিল। তারা খাল থেকে নদীর পানি সমতল ভূমিতে নিয়ে যেত এবং জল সেচের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন করত। এভাবেই সমগ্র পূর্ব চীনে শস্যক্ষেত ও ফলবাগান ঘেরা অসংখ্য জনবসতি গড়ে উঠেছে। এরপর গড়ে উঠেছে বড় বড় নগর। খ্রিস্টপূর্বাব্দেই চীনে গঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র।

রণলিপ্সু হূন উপজাতিরা যাযাবরের ন্যায় জীবনযাপন করত। তারা প্রায়ই চীনের গ্রাম ও নগর আক্রমণ করত। লুট করে নিয়ে যেত জনগণ ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সম্রাট শি হুয়াং তি চীনকে রক্ষা করার জন্য মহা প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দেন। প্রাচীর নির্মাণের জন্য অসংখ্য চাষী, দাস, সৈনিক ও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের সমাবেশ ঘটান। এরপর প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছে। প্রাচীরটি প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এর চওড়া স্থান দিয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি পাঁচজন অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারত। প্রাচীরটি চীনের 'গ্রেট ওয়াল' নামে খ্যাত।

আদিম সভ্যতার বিকাশ পর্বে চীনারা ধীরে ধীরে লিখন পদ্ধতি ও চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান লাভ করে। প্রাচীন চীনের সভ্যতাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয় শাং ও চৌ রাজবংশ। হোয়াংহো নদীর তীরে গড়ে উঠেছে শাং রাজাদের সভ্যতা। শাং যুগে ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র বেশি ব্যবহৃত হতো। শাং যুগের মানুষ মাটি দিয়ে ঘর নির্মাণ করত। ঘরগুলো ছিল আয়তাকার। ছাদগুলো ছিল ত্রিকোণাকৃতির। শাং পুরোহিতরা গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। শাং যুগে চীনা মাটির পাত্র তৈরি হতো। মানুষ শিকারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত তীর-ধনুক। কারিগরদের উদ্ভাবিত চাকায় তৈরি করা হতো দুই ঘোড়ার টানা রথ। শাং যুগ থেকেই চীনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে। এ যুগেই আবিষ্কৃত হয় লেখার তুলি ও কালি। শাং লিপিকাররা রেশমের কাপড়ের উপর লিখতেন। শাং যুগে উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হলেও নরবলি প্রথা চালু ছিল।

শাং তি ছিল বৃষ্টি, শস্য ও যুদ্ধের দেবতা। হতভাগ্য যুদ্ধবন্দীদের উৎসর্গ করা হতো তার নামে। শাং সমাজই হচ্ছে পূর্ব এশিয়ার সভ্যতার প্রথম প্রতিনিধি। শাং যুগ শুরু হয়েছে ১৭৬৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর সমাপ্তি ঘটেছে ১১২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পশ্চিম দিক থেকে শাং রাজাদের রাজধানীতে আঘাত হানে দুর্ধর্ষ চৌ জাতি। এতে শাং রাজাদের পতন ঘটে। চৌরাজাদের আধিপত্য ৮৭৩ বছর টিকে ছিল। সাহিত্য ও দর্শনে চৌ যুগের অবদান ছিল সর্বাধিক। ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে চীনে বেশ কিছু লিখিত গ্রন্থের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।। এসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'Book of Changes', 'Document Classic', 'Book of Eliquette', 'Book of Poetry' ইত্যাদি। চৌ রাজাদের আমলেই (১১২২-২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) দার্শনিক লাওৎসে (Laotze : ৬০৪-৫১৭ খ্রি: পূ:) ও কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রি: পূ:) জন্ম লাভ করেন।

লাওৎসের মতবাদ তাওবাদ নামে প্রচলিত। তিনি মানুষকে নৈতিকতার পথ দেখান। তার দর্শনের মূল বিষয় ছিল ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রচার করেন, মানুষের অসুখী হবার মূলে রয়েছে তার স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা মানুষের শঙ্কাকে বাড়িয়ে দেয় এবং মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। তাই তিনি মানুষকে স্বার্থপরতা উচ্ছেদের পরামর্শ দেন। লাওৎসের মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, যিনি প্রাকৃতিক নিয়মকে বাধাগ্রস্ত করেন না। তিনি সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী নন। বুদ্ধিজীবীরা জীবনকে আইন ও নিয়মে বেধে রাষ্ট্রের ক্ষতি করেন। সাধারণ মানুষ কখনো রাষ্ট্রের ক্ষতি করে না। আকাশ, নদী, ঋতু ও নক্ষত্র প্রত্যেকেই প্রকৃতির বিধান অনুসারে চলে। এর সঙ্গে মানুষ যদি সঙ্গতি রেখে চলে তবে মানব জীবনে পূর্ণতা আসে। লাওৎসে বলতেন, 'যদি কেউ তোমাকে আঘাত করে, তাকে তুমি ক্ষমতা কর, তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার কর। তাও ধর্ম মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করে না। এ ধর্ম ঈশ্বর সম্পর্কে নীরবতা পালন করে। অহিংসা, ক্ষমা ও দয়া হচ্ছে তাও ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

চীনের ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাবশালী দার্শনিক হচ্ছেন কনফুসিয়াস। তিনি চীনাদের আদর্শ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচটি কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসব কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে ১. চীন ঐতিহ্যকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে; ২. শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে; ৩. সৎ হতে হবে; ৪, পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সদয় হতে হবে; ৫. নিজের অপছন্দনীয় কাজ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এ পাঁচটি কর্তব্যকে এক সঙ্গে বলা হয়, 'Five Ching'। এছাড়া 'Four Chu' নামে কনফুসিয়াসের একটি বাণী সংকলন রয়েছে। এ চারটি বাণীর মধ্যে রয়েছে-

১. নিয়মাবর্তী পরিবার ও ব্যক্তির মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে।

২. সমাজ উন্নয়নের মূল মর্ম আত্ম উন্নয়নের মধ্যে নিহিত।

৩. প্রত্যেকের উচিত নিজেকে আদর্শবান ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলা।

৪. প্রত্যেক মানুষকে পক্ষপাতমুক্ত থাকা উচিত।

কনফুসিয়াসের দর্শন চীন ও পূর্ব এশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। জাপান, কোরিয়া ও ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে কনফুসিয়াসের দর্শন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। কনফুসিয়াসের সমস্ত উপদেশের মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করা। কনফুসিয়াস মনে করতেন 'মানুষ মহৎ, সে ঈশ্বরের বিধানেই মহৎ। যে মানুষ অধম, সে ঈশ্বরের বিধানেই অধম।' রাজার কর্তব্য হচ্ছে উত্তম রাজা হওয়া। প্রজার কর্তব্য হচ্ছে উত্তম

প্রজা হওয়া। কনফুসিয়াসের শিষ্য মেঙজু মনে করতেন, সমাজের যে অসাম্য তা বিধাতারই বিধান। কনফুসিয়াসের নীতি ধর্মের নাম হচ্ছে লি (Li)। লি ধর্মের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সামাজিক ব্যবহারে সৌজন্য প্রকাশ এবং শালীনতার নিয়ম-কানুন অনুশীলন। কনফুসিয়াসের মতে, রাজার উপর আস্থা হারিয়ে ফেললে তার প্রতি প্রজাদের বিদ্রোহ প্রকাশ সমর্থনযোগ্য এবং ন্যায়সঙ্গত।

রাজা ব্যর্থ হলে ঈশ্বর তার পরোয়ানার শক্তি তুলে নেন। ফলে রাজা দেশ শাসন থেকে বঞ্চিত হন। তখন প্রজারা রাজার উপর আস্থা হারিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। শাসকদেরকে প্রজার প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণের পরামর্শ দেন কনফুসিয়াস এবং বিনা উৎপীড়নে শাসনকার্য পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কনফুসিয়াস ছিলেন প্রাচীন চীনের ঐতিহ্যের পূজারী। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রাচীন আচার, প্রথা, পদ্ধতি ও চিন্তাধারা দেশে পুন: প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি অনিবার্য। তিনি চীনের প্রাচীন বিদ্যা উদ্ধার করেন এবং এ বিষয় গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'Analects', 'The Great learning', 'Doctrine of the Mean', 'Book of Changes', 'Book of History', 'Book of Poetry' 'Book of Rites', The Spring and', 'Autuman Annals' ইত্যাদি। ২০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কনফুসিয়াসের দর্শন ধর্মে রূপান্তরিত হয়। এ দর্শনের পুরোহিতরা পরিণত হন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিতে। কনফুসিয়াসের দর্শন অনুসরণ করতে গিয়ে চীনের মানুষ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের উপর গুরুত্ব দেন। ফলে চীন দেশে জ্ঞান চর্চা সব সময়ই অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সম্রাট স্বয়ং চীনের প্রাচীন বিদ্যার ধারক ও বাহক হিসাবেকাজ করতেন। চীনের জেন্ট্রি শ্রেণী কনফুসীয় দর্শনের ধর্মগ্রন্থগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সমাজের অনেকেই কনফুসীয় দর্শনের প্রাচীন বিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সমাজে সম্মানিত আসনের অধিকারী হতেন।

চীনারা মনে করত পশ্চিমী জীবনধারা অপেক্ষা চীনের চিরাচরিত জীবন অনেক উন্নত। এ কারণে চীনের মানুষ পশ্চিমী ধাঁচের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। কনফুসীয় অনুশাসনের ফলে চীনের সমাজে নীতি জ্ঞান প্রসার লাভ করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ হয়ে ওঠে প্রতিবাদমুখর। চৌ বংশের রাজারা কনফুসীয় দর্শন চর্চার অবাধ সুযোগ দেন। ফলে তা সমাজের গভীরে শেকড় ছড়িয়ে পড়ে। চৌরা ক্ষমতাচ্যুত হবার পরও কনফুসীয় দর্শনের প্রভাব হ্রাস পায়নি। ২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চৌ রাজবংশের অবসান ঘটলেও প্রাচীন সভ্যতার অবসান হয়নি। এরপর আরো দুটি প্রাচীন রাজবংশ প্রাচীন সভ্যতার

ধারা অটুটু রাখে। এ দুটি রাজবংশ হচ্ছে চীন রাজবংশ (Chin Dynasty : 221-2006 B.C) এবং হান রাজবংশ (Han Dynasty : 2006 B.C-220 A.D) । হান বংশের আমলে চীনে ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধি পায়। হান বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন উ-তি। সে সময় রোম সাম্রাজ্য ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী। কিন্তু চীন ছিল রোমের চেয়ে বড়। রাজা চীনের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। হান রাজাদের আমলে আবিষ্কৃত হয় কাগজ ও ছাপাখানা। হান রাজারাই প্রথম সরকারী চাকরিতে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাদের আমলেই কনফুসীয় নীতিতত্ত্ব চীনা জনগণের মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে শেকড় ছড়িয়ে দেয়। এ সময় চান্দ্র পঞ্জিকা ও ভূমিকম্প নির্দেশক যন্ত্র প্রচলিত হয় এবং রেশম শিল্পের বিকাশ ঘটে।

চীনারা নিজেদেরকে হান বংশের সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। হান বংশের সম্রাটরা বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। তারা সশস্ত্র হূন যোদ্ধাদের পরাজিত করেন। দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অসংখ্য হূন হান বংশের রাজাদের হাতে বন্দী হন। তারা দাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হান বংশের রাজারা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাবার জন্য ব্যবহার করতেন রেশম মহাসরণী (Great Silk Route)। এ পথ দিয়েই তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন রেশমের কাপড়ের ব্যবসা। তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রেশমের পণ্য উৎপাদনের কৌশল অজানা ছিল। ফলে চীনারা এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

প্রাচীনকালে চীন দেশের মানুষ অসংখ্য লোককাহিনী, গল্প ও গান সৃষ্টি করেছে। এসব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তাদের মনের কথা। সে সময় তাদের ঘরবাড়ি নির্মিত হতো কাঠ দিয়ে। ফলে তা আধুনিককাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। প্রাচীন চীনের ব্রোঞ্জ ও পাথরে নির্মিত পাত্রের গড়ন ছিল নানা রকম। পাত্রের গাঁয়ে আঁকা থাকত ড্রাগন কিংবা জন্তু-জানোয়ারের চিত্র। ধনীগৃহ, গরীবের কুঁড়েঘর ও শ্রমিকের ছবি তৈরি হতো মাটি দিয়ে। প্রাচীনকালের রিলিফচিত্রে প্রকাশিত হয়েছে দাসদের প্রতি সহানুভূতি। অর্থাৎ সে সময়েও মানুষের মনের বিক্ষোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর চিত্রকর্মে।

চীনারা একটি শঙ্কর জাতি। তবে বেশিরভাগ চীনা অধিবাসীর উৎপত্তি মোঙ্গলীয় জাতি থেকে। মোঙ্গলীদের সঙ্গে মিশেছে বহিরাগত হূন, তাতার, তিব্বতী, বর্মী, হান ও মাঞ্চু উপজাতি। চীনদেশ বহুজাতি ভিত্তিক হওয়ায়

চীনারা একাধিক শাখায় বিভক্ত। যথা-হান, চুয়াং, উইঘুর, হুই, য়ি, তিব্বতী, মিয়াও, মাঞ্চু, মোঙ্গল প্রভৃতি। তাদের মধ্যে হানদের সংখ্যাই নব্বই শতাংশের অধিক। চীনা জাতি বহুজাতিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে একটি আদর্শিক মিল।

প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলো গড়ে উঠতে সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর। এরপর একটি পর্যায়ে এসে তা ক্ষয় হতে শুরু করেছে। এর মূলে রয়েছে মানুষের নতুন আবিষ্কার। চীনের প্রাচীন যুগ মধ্যযুগে পরিণত হতে সময় লেগেছে প্রায় চারশত বছর। সে সময়ে সভ্যতার অগ্রগতি থেমে থাকেনি। তবে তা বিকশিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশের সময় মানুষ আবিষ্কার করেছে কৃষিযন্ত্র, যানবাহন, লিখন পদ্ধতি প্রভৃতি। তবে ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করার সময় সবচেয়ে বড় লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নগরায়নের মাধ্যমে। এ সময় কৃষি উৎপাদনকে গতিশীল করার জন্য প্রচুর শ্রমশক্তি জড়ো হয়েছে কৃষি জমির কাছে। আর মানুষ কৃষি উপকরণ তৈরি করতে করতে গড়ে তুলেছে শিল্প-কারখানা। কিন্তু মধ্যযুগের শুরুতে মানুষের এসব কর্মকৌশল স্থবির হয়ে পড়ে। সামন্ত কাঠামোর অভ্যন্তরে জন্ম নেয় গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি। নগর নির্মাণের প্রক্রিয়া থেমে যায়। চীনেও একই অবস্থা বিরাজ করে। বর্বর গোত্রের আক্রমণে চীন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। হান রাজবংশের রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙে পড়ে। এ সময় চীনের ইতিহাসে শুরু হয় অন্ধকার যুগ (২২০-৫৯০ খ্রি:)। অন্ধকার যুগে চীনের মানুষ উদ্ভাবন করে চায়ের ব্যবহার, একচাকা বিশিষ্ট ঠেলাগাড়ি, পানিচালিত কল, পালকি ও ঘুড়ি। অন্ধকার যুগে আবিষ্কৃত হয় কম্পাস।

চীনের উত্তরে ছিল মোঙ্গল জাতির বসবাস। তাদের মধ্যে দুটি দুর্ধর্ষ উপজাতির নাম ছিল হূন ও তাতার। তারা সুযোগ পেলেই চীনের ভেতরে প্রবেশ করে লুটপাট করত এবং লুটপাট করে নিজেদের এলাকায় চলে যেত। তাদের আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষার জন্যই নির্মাণ করা হয় চীনের প্রাচীর। মোঙ্গল জাতির দুর্ধর্ষ সেনাপতি চেঙ্গিস খাঁ (১১৬২-১২২৭ খ্রি:) চীনের রাজধানী পিকিং আক্রমণ করেন। মোঙ্গলরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাম্রাজ্য দখল করে; কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেশ শাসন করতে পারেনি। তাদের সংস্কৃতির কাছে চীনারা পরাজিত হয়নি। বরং মোঙ্গলরা চীনা সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেই চীন শাসন করে। চীনে তাদের শাসন চলে প্রায় একশত বছর। তাদের

তাড়ানোর জন্য চীনারা বহু বিদ্রোহ সংঘটিত করে। মিং বংশের শাসকরা মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেন।

চীন জাতি কখনই বিদেশী মূল্যবোধের কাছে মাথা নত করেনি। সকল প্রতিকূল পরিবেশেই তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। চীনের সম্পদ ও ঐশ্বর্যে ইউরোপীয় বণিকরাও আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু তারা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও মধ্যযুগে ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশ থেকেই বিদেশী বণিকরা চীনে গমন করেন। তাদের সঙ্গে যেতেন খ্রিস্টান পাদ্রীরাও। প্রথম দিকে চীন দেশে বাণিজ্য শুরু করে পর্তুগিজ, ওলান্দাজ, রাশিয়ান, ইংরেজ ও ফরাসি জাতি। তাদের অবস্থা দেখার জন্য চীনা রাজারাও রাজদূত প্রেরণ করতেন। বিদেশীরা নানাভাবে চীনাদের পরাজিত করতে চেয়েছে। ইংরেজরা চীন জাতির নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করার জন্য চীনে আফিম রফতানি করেছে। চীনকে আফিম মুক্ত করার জন্য আফিম বিরোধী যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে হয়েছে। আফিম-যুদ্ধ চলেছে প্রায় দুই বছর। আফিম যুদ্ধের কথা চীনারা কখনই ভুলতে পারেনি।

চীনারা হচ্ছে একটি প্রাচীন সভ্য জাতি। সে দেশে বহু রাজবংশ রাজত্ব করেছে। কোনো কোনো রাজবংশ কয়েকশ বছর ধরে রাজত্ব করেছে। তারা সব সময়েই চীনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। তারা বিদেশী দর্শনকে নিজেদের মতো করেই আত্মস্থ করেছে। এ কারণেই তাদের দেশে সমধর্মী রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশ ঘটেছে। তাওবাদ ও কনফুসিয়াসবাদের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মকেও চীনারা আত্মস্থ করেছে। হান রাজবংশের মিং তি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ভারত থেকে বৌদ্ধ শ্রমণদের নিয়ে যান।

চীনা জাতির মূল ঐশ্বর্য হচ্ছে ত্যাগ ও বিনয়। তাদের ত্যাগের আদর্শের ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক দর্শন। চীনা জ তি সব সময়েই মহৎ উপলব্ধির নৈতিক দর্শনকে লালন করেছে। এ কারণে তাদের সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে রয়েছে একটি মানবিক আবেদন। চীনের লোকসংস্কৃতি থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছে তাদের জাতীয় সংস্কৃতি।

চীনা জাতি প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনড়। তারা স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে বিদেশী শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। চীনা জাতির ঘরে-বাইরে কোথাও পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব পড়েনি। ফলে তারা নিজেদের সংস্কৃতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পেরেছে। চীনাদের উপর সব সময়েই কনফুসীয় নীতির প্রবল প্রভাব ছিল। তাদের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল বিশ্বের সকল দেশের চেয়ে চীনের সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠতম। তারা নিকৃষ্টমানের সভ্যতা দ্বারা

পরিবেষ্টিত। চীন সভ্যতা সকল সভ্যতার মধ্যমণি এবং পশ্চিমী সভ্যতা চৈনিক সভ্যতার চেয়ে নিম্ন মানের। এ কারণে পশ্চিমী সমালোচকরা চীনকে অহঙ্কারী জাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আধুনিককালের আগে চীনা সমাজ ছিল গ্রাম প্রধান। ৮০ শতাংশ লোক বসবাস করত গ্রামে। বাকিরা বসবাস করত শহরে। শহরে বসবাসকারী লোকের মধ্যে ছিলেন কনফুসীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, রাজ কর্মচারী, বণিক শ্রেণী, জেন্ট্রি শ্রেণী, সামরিক ব্যক্তি ও কারিগর। সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাজ কর্মচারীদের নিয়োগ করা হতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হতো প্রাচীন বিদ্যার প্রতি।

চৈনিক সমাজে কৃষক শ্রেণীর অবস্থান ছিল সুউচ্চে; তবে বিদ্বৎ শ্রেণীর নিচে। কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন করে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখত। এ জন্য তারা গৌরবজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। চীনা সমাজে সৈনিকদের মূল্য ছিল কম। একটি চৈনিক প্রবাদে আছে পেরেকের জন্য উৎকৃষ্ট লোহা লাগে না, তেমন সেনাবাহিনী গঠনের জন্য সৎ মানুষ সংগ্রহ করা হয় না। চৈনিক সমাজ ব্যক্তি কেন্দ্রিক ছিল না। ছিল পরিবার কেন্দ্রিক। পরিবারের প্রধান ছিলেন বাবা।

কনফুসীয় অনুশাসনের ফলে চীনা সমাজে নীতি জ্ঞানের চর্চা ব্যাপক প্রসার ঘটে। ঐতিহ্যমণ্ডিত চীনা সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার নৈতিকভাবে সমর্থিত ছিল। চীনা সমাজের প্রাচীন জ্ঞানের শেকড় মূল্যবোধের অনেক গভীরে প্রোথিত ছিল। এ কারণে বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদেরকে সহজে প্রভাবিত করতে পারেনি। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেক বিলম্বে চীনের সমাজে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তা দৃঢ়ভাবে শেকড় ছড়াতে পারেনি। এসব জ্ঞান তারা নিজেদের মতো করেই আত্মস্থ করেছে।

দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর ধরে সামন্ত ভূ-স্বামীদের দ্বারা শাসিত চীন প্রকৃত পক্ষেই অগ্রসর ছিল। চতুর্দশ শতকের পর হঠাৎ করেই চীন অনগ্রসর জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়। চীনের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় উৎপাদন যন্ত্রগুলো সেকেলে হয়ে পড়ে।

চীনে ইউরোপের দ্বিগুণ সময় সামন্তবাদ কার্যকর ছিল। চীনারা সহজে পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেনি। চীনের কৃষকরা হস্তশিল্পজাত পণ্য নিজেরাই প্রস্তুত করত। চীনের প্রভাবশালী সামরিক নেতা লি হং-চ্যাং ও সেং কয়ো-ফ্যান সামরিক পশ্চিমী সামরিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দেন। তারা অনুধাবন করেন, চীনের দুর্বলতার কারণ প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সামরিক বিদ্যা সম্পর্কে

অজ্ঞতা। তীর, ধনুক এবং দেশীয় কামান দিয়ে মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধ-জাহাজ সংবলিত পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে লড়াই করে চীনের পক্ষে বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। এরপর থেকেই চীন পাশ্চাত্য সমর সজ্জায় সজ্জিত হতে শুরু করে। কিন্তু তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্যকে বিসর্জন দেয়নি। এ ব্যাপারে তাদের ভাষা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। ভারতীয়রা যত সহজে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য মেনে নিয়েছে, চীনারা তত সহজে বিদেশী ভাষার আধিপত্য মেনে নেয়নি।

অধ্যায় : ছয়

বাঙালি থেকে বাংলাদেশী

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে কৃষি সভ্যতা গড়ে ওঠার মূলে ছিল এ অঞ্চলের উর্বর ভূমি ও সুপেয় পানি। এখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় নদী। নদীগুলো নৌপথ রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। আন্তর্দৈশিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথ ব্যবহার করেই অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশ উপমহাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সুতিবস্ত্র মসলিন তৈরি হতো বাংলাদেশে। মসলিন ছিল মোঘল সম্রাটদের প্রিয় বস্ত্র। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মসলিনকে ব্যবহার করতেন ফ্যাশন হিসাবে। সোনারগাঁয়ের চিত্রিত ঘোড়া ও হাতি ছিল সারা ভারতবর্ষে জনপ্রিয়।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ কারণে গ্রামের জনগণকে নিজেদের বাইরে যেতে হতো না। আশে-পাশের হাট বাজার ও মেলায় পাওয়া যেত প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী। গ্রামে গ্রামে উৎপাদিত হতো কাঁসা-পিতল-তামা, কাঠ-বাঁশ-বেত এবং লোহা-মাটির কারুপণ্য। বাংলাদেশের নকশিকাঁথার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া।

নগরায়নের প্রভাবে তামা-কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র অপসাধিত হয়েছে নিজের স্থান থেকে। মাটির তৈজসপত্রের স্থান দখল করে নিয়েছে এ্যালুমিনিয়াম ও মেলামাইনের তৈজসপত্র। গ্রাম জুড়ে শুরু হয়েছে পরিবারের ভাঙন। নদীর ভাঙনের মতো ভেঙেছে কারুশিল্পীদের পেশা। কারিগরি উৎপাদন প্রথার স্থান দখল করে নিয়েছে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি। সময়ের দিক

থেকে বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়েই প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঘোর কাটিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে আধুনিক যুগে। কিন্তু এর ছোঁয়া সর্বত্র লাগেনি। তাই পুরোনো উৎপাদন প্রথাও টিকে আছে।

একটি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস হচ্ছে তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং উৎপাদন যন্ত্রের ধারাবাহিক বিকাশ। তাই আমাদের গৌরবময় অতীতকে মুছে ফেলার সুযোগ নেই। কৃষক ও কারুশিল্পীরাই এদেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে। তারা যেমন আমাদের পারিবারিক চাহিদা মিটিয়েছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে কালজয়ী শিল্পকর্ম। তাদের প্রাণোৎসর্গ ও ত্যাগের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের বিশাল একটি জনগোষ্ঠি ছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষর। তারা বিংশ শতাব্দীতে বসবাস করেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজের জন্য কলকাতা ও তার শহরতলীর যে অবস্থা ছিল, ১৯৪৭ সালের পরে ঢাকাতেও একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন হলেও উভয় দেশের মানুষের জীবনে চেপে বসে ইংরেজ আমলের শতাব্দীব্যাপী অন্ধকার। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উর্দুর দ্বারস্থ হতে হয়। কলকাতার বাঙালি হিন্দুদের দারস্থ হতে হয় হিন্দির। বাঙালি হিন্দুরা সর্ব ভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দিকে গ্রহণ করে। তারা বার বার রাষ্ট্রভাষা পরিবর্তনে অভ্যস্থ ছিল। হিন্দু শাসনামলে রাজভাষা হিসাবে সংস্কৃতি, মুসলমান শাসনামলে ফার্সি এবং ইংরেজ আমলে সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়নি তাদের। ভারত স্বাধীন হলে আবার তারা একইভাবে হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কোনোভাবেই উর্দুকে মেনে নেয়নি। এদেশে পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরের মধ্যেই রোপিত হয় ভাষা আন্দোলনের বীজ। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য দিয়েই তার শেষ হয়।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির অন্তরে পৌছে যায় অসাম্প্রদায়িক চিন্তার আলোক প্রবাহ। এর মাধ্যমে বাঙালি বিশ্ব চিন্তার অংশীদার হয়। তারা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং স্বাধীন হবার স্বপ্ন দেখে।

পূর্ব বাংলার জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে পদচ্যুত করে। তাতে তাদের তেমন কিছু লাভ হয়নি। বরং তার চেয়েও নিষ্ঠুর এক ব্যক্তি সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি হলেন ইয়াহিয়া খান। তার রাজোচিত আচরণ কোনোক্রমেই নাদির শাহের চেয়ে কম ছিল না। নাদির শাহ ভারত থেকে লুণ্ঠন করেছেন ময়ূর

সিংহাসন আর কোহিনূর হীরা। ইয়াহিয়া প্রমাণের চেষ্টা করেছেন তিনি নাদির শাহের বংশধর। তবে তার একটি অহঙ্কার ছিল। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের বিরুদ্ধে মিশর, সুদান, ইরাক, সাইপ্রাস ও ইতালিতে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু প্রাচ্যের ধারক হিসাবে তার উপজাতীয় মানসিকতা কাটেনি। বরং তার আচরণ ছিল গোঁড়ামিতে ভরা। ইসলাম মানুষকে বিনয়ী হতে শিক্ষা দিলেও তিনি ছিলেন উদ্ধত।

ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা চলে যাবার পর জুলফিকার আলী ভুট্টোও ভীষণ উদ্ধত হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভাবতে শুরু করেন। আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো মিলে গণতন্ত্রকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। তাদের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাই ছিল না। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এ ধরনের চিন্তার অস্তিত্ব ছিল না। তারা ছিল নিজেদেরকে মুক্ত করার চিন্তায় ব্যস্ত। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা ভেবেছেন রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে। আর বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ভেবেছেন জনগণ নিয়ে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা গণহত্যার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণকে নির্মূল করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তারা কখনই চিন্তা করেননি, গণহত্যার মাধ্যমে কোনো জাতিকে নির্মূল করা যায় না।

ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর বাঙালিদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। কারণ, তিনি নিজেকে ভাবতেন জমিদারের ছেলে। আর বাঙালিদের ভাবতেন কৃষক। ভুট্টোর জন্ম ১৯২৮ সালে। তার পূর্ব পুরুষ অষ্টাদশ শতকে রাজপুতনা থেকে সিন্ধু চলে যায়। এরপর তারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়। ব্যাপক সম্পত্তি ও পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়ে ভুট্টো পরিবার পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব পরিবার সম্পর্কে বাঙালিদের এক ধরনের ঘৃণা ছিল। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি সম্পদকে কেন্দ্র করেই তারা ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল।

ভুট্টো ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। তিনি নিজেকে ভাবতেন গণতন্ত্রমনা। অথচ তিনি তিরিশ বছরে বয়সে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের মন্ত্রীপরিষদের বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি কখনোই কোনো রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্ব মেনে নেননি। তার অনমনীয় মনোভাবের জন্য সত্তরের নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার মানুষের মাথা পর্বত শৃঙ্গের মতো উঁচু হয়ে যায়। আর সেখান থেকে উৎগীরণ হতে থাকে লাভাস্রোত। এর আঁচ ইয়াহিয়া খানের গায়ে লাগলেও ভুট্টোর গায়ে লাগেনি। এ কারণেই বাঙালিদের হত্যার মাধ্যমে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ইয়াহিয়া খান মৃত্যুর পাহাড় গড়ে তোলেন। ইয়াহিয়াকে বাঙালিরা উচিত শিক্ষা দেয়। কিন্তু ভুট্টো তাতে বিচলিত না হয়ে খণ্ডিত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। তার কাছে দেশের চেয়ে ক্ষমতার

আসনকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এটা একজন অসংস্কৃতিবান মানুষেরই পরিচয়। সংস্কৃতিবান ব্যক্তির কাছে মানুষের চেহারা মূর্ত হয়ে ওঠে মানবিকতায়। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি থাকেন সতর্ক। কিন্তু ভুট্টোর মধ্যে কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ছিল না।

একটি জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তাদের দেশের রাজনীতির মাধ্যমে। কোনো রাজনৈতিক দলের আন্দোলন মানেই হচ্ছে ক্ষমতা নির্ধারণের সংগ্রাম। অরাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা যত তুর্যনিনাদ দিয়েই শুরু হোক না কেন- তা একাত্তর দিয়ে শেষ হতে বাধ্য। যেমন পোশাক বদল করে মানুষ বদল করা যায় না, তেমনি সাংবিধানিক ভিত্তি ছাড়া কোনো ক্ষমতা বৈধতা অর্জন করতে পারে না।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা মনে মনে ভাবতেন এবং বলতেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী। কারণ, তারা নিজেদের দেশটা দখল করে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তাদের দাম্ভিক আচরণেই একটি একাত্তরের জন্ম হয়। হিটলার ও মুসোলিনিও নিজেদের দেশকে একইভাবে ধ্বংস করেন। এসব নিষ্ঠুর শাসক নিজেদের দেশের অগণিত মানুষকে মৃত্যুর সীমানায় পৌঁছে দেন। তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যান।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরাট অংশ জুড়ে ছিল যৌথ সংস্কৃতি ও সভ্যতা। কিন্তু ধর্মীয় বিরোধ দুই অংশকে দ্বি-খণ্ডিত করে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মনের গভীর স্তরে ছিল সর্বভারতীয় চিন্তার অভিখাত। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মানুষ নিজেদেরকে স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এ অঞ্চলের মানুষ কখনই ভারত কিংবা পাকিস্তানের অংশ হতে চায়নি। নানা রকম ঐতিহাসিক ঘটনা ও আন্দোলনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের ইতিহাস সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়।

বাঙালির রক্তধারার মধ্যে অস্ট্রিক, তিব্বত, পাঠান, মোগল, ইরান, আরব, পর্তুগিজ, তুর্কি, আর্য, অনার্যসহ বহু রক্তধারার মানুষ মিশেছে। এ মিশ্রণ বহু শতাব্দী ধরে চলেছে। এর মাধ্যমেই বাঙালিরা একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছে। জাতি গঠনের প্রাথমিক স্তরে অনেক দর্শনকেই তারা গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজেদের দর্শনকে বিসর্জন দেয়নি। মৌর্য ও গুপ্তরা বাঙালিকে পরাজিত করতে পারেনি। দিল্লীর সুলতানদের কাছে বাংলার পরিচিতি ছিল বিদ্রোহী দেশ হিসাবে। সম্রাট আকবর বাংলায় মোগল শাসন কায়েম করতে পারেননি। ইংরেজ আমলে বাংলা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হলেও এ অঞ্চলের মানুষ ভারতীয় পরিচয়ে অভিষিক্ত হতে চায়নি। ফলে তারা পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেয়।

পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা বাঙালিদের অবহেলার চোখে দেখেছে। এ কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ ভাষার নামে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। আধুনিক রাষ্ট্রের সকল উপাদান রয়েছে এ রাষ্ট্রে।

বাংলাদেশের জনগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি। কারণ, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাসের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্রের প্রতি রয়েছে তাদের আনুগত্য। এদেশের মানুষ একটি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের কথা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছে। জাতীয়তা হচ্ছে এমন এক ধরনের সামষ্টিক অনুভূতি, যা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে একটি জাতির রাষ্ট্রীয় দর্শনে রূপ লাভ করে এবং নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা যোগায়।

এদেশের মানুষ কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে শত শত বছর ধরে সুখে-দুঃখে এক সঙ্গে বসবাস করেছে। তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু তারা একে অপরকে ত্যাগ করেনি। বরং ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রেরণা নিয়েই তারা স্বাধীন থাকার জন্য যুদ্ধ করেছে।

উপমহাদেশের অনেক অঞ্চলের সঙ্গেই এদেশের সমাজ কাঠামোর সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ কখনই বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন কিংবা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের জয়গান ঘোষণা করতে পারেনি। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যার চাষযোগ্য জমির আয়তন বছর বছর পরিবর্তিত হয়। উনিশ-বিশ শতকে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এদেশের মানুষের ভাগ্যের যে পরিবর্তন হয়েছে তা রাজনৈতিক পরিবর্তনের চেয়েও অনেক বেশি প্রবল।

উপমহাদেশের সবচেয়ে বাঙময় অংশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এদেশের মানুষ কখনই নিজেদের আত্মপরিচয় ত্যাগ করেনি। প্রবাহমান নদীর মতোই তাদের চরিত্র। শুষ্ক মৌসুমে যখন নদীগুলো শুকিয়ে যায়, জলধারা নদীর তলদেশে নেমে যায়, তখন নদীগুলোর রুদ্র চরিত্র থাকে না। কিন্তু প্রবাহ থাকে। বর্ষা মৌসুমে নদীগুলো ফুঁসে ওঠে। এদেশের মানুষগুলো খুব শান্তিপ্রিয়। তাদের আত্মপরিচয়ে যখন আঘাত লাগে, তখন তারা বর্ষার নদীগুলোর মতো ফুঁসে ওঠে। নদীর তীরের জনপদগুলোর মতোই অত্যাচারী শাসকদের সিংহাসন ভেঙে তছনছ করে দেয়। তারা ধর্মীয় পরিচয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

নিয়ে ইংরেজ শাসকদের পরিত্যাগ করে। ধর্মের নামে যখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, তখন তারা অসম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের সমধর্মী সংস্কৃতির রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। জাতি হিসাবে বাঙালিরা অত্যন্ত পুরোনো ঐতিহ্যের অধিকারী। খ্রিস্টের জন্মের আগেই তারা গঙ্গাঋদ্ধি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তখন রাষ্ট্র পরিচালনার বিধানগুলো ছিল বিমূর্ত। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে জাতিই নিজেদের সংবিধানকে মূর্ত করে তোলে। এটা তারা পেরেছে, কারণ তাদের সংস্কৃতির মূর্ত রূপ ছিল। ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের অঙ্গীকার ছিল দৃঢ়ভাবে সংহত।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংস্কৃতি পরিপোষণ ও উন্নয়নের রূপরেখা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতে পারে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়। ফলে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন রয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সরকার জাদুঘর, লোকশিল্প জাদুঘর, পুরাতত্ত্ব বিভাগ, বাংলা একাডেমীসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নিজ নিজ কর্মপরিধি। এছাড়া রাষ্ট্র ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের বুক চিরে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ-নদী। এসব নদীর মধ্যে রয়েছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, করতোয়া, সুরমা, গোমতি, কর্ণফুলী, মধুমতি, ভৈরব, মাতামুহুরি, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, ধলেশ্বরী, মাথাভাঙ্গা ইত্যাদি। এসব নদীর তীরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য জনবসতি, শহর ও নগর। নদীর ভাঙনে অসংখ্য নগর ও জনপদ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এদেশের মানুষ টিকে আছে।

বাংলাদেশের আদি পর্বে বগুড়া জেলার রায়পুর ইউনিয়নের মহাস্থান গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে পুণ্ড্রনগর। মহাস্থান এবং এর সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে বহু উপকথা। এসব উপকথার চরিত্রগুলো হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্য রচনার উপাদান। মঙ্গল কাব্যের এক কালজয়ী চরিত্রের মধ্যে রয়েছে বেহুলা, লক্ষীন্দর, চাঁদ সওদাগর ইত্যাদি। একটি উপকথা অনুসারে মহাস্থানের সর্বশেষ হিন্দু রাজার নাম পরশুরাম। তার ছিল শিলাদেবী নামে

একজন অনিন্দ্য সুন্দরী বোন। শিলাদেবী এক দরবেশকে ছুরি দিয়ে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। পরে সে করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। শিলাদেবীর আত্মহত্যার স্থানটি শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। এখনো প্রতিটি চৈত্র সংক্রান্তিতে 'পবিত্র স্নান' করার জন্য শিলাদেবীর ঘাটে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। সেখানে হাজারো কারুপণ্যের মেলা বসে। দরবেশের মাজারে জমে হাজার ভক্তের ভিড়। এদেশের মানুষ দরবেশ এবং শিলাদেবী দু'জনকে গ্রহণ করেছে। এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে লোকজ ঐতিহ্যের মূল সুর। এসব দর্শনের মধ্যে রয়েছে বাঙালিদের মিলেমিশে থাকার আত্মদর্শন। তাদের কাছে বেহুলা ও চাঁদ সওদাগরের চরিত্র সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দেশপ্রেমে বিহ্বল বাঙালির মননের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার আকাঙ্ক্ষা সব সময়ই ছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিভিন্ন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। এদেশের মানুষ নিজেদের দেশকে সে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বাঙালির যে মানস গঠন করেছে, সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সে মানসের ধ্বংস সাধন সম্ভব নয়। যত শক্তি নিয়েই একদলীয় শাসন কায়েম করা হোক না কেন, তার অবসান হতে বাধ্য। ঊনিশ শ' একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও মুক্তিযুদ্ধকে দ্বিধা বিভক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। এদেশের মানুষ তাতে বিভ্রান্ত হয়নি। সকল শ্রেণীর মানুষ এক কাতারে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। এ কারণে তাদের জন্য বাঙালি থেকে বাংলাদেশী হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উপমহাদেশে রাজ্য ভাঙাগড়ার ইতিহাসে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ অঞ্চলে বিভিন্ন নৃপতি, রাজবংশ ও স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু জাতীয় চেতনার স্বরূপ স্পষ্ট ছিল না। দীর্ঘকাল ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে।

উপমহাদেশে ভাষাগত অভিন্নতার জন্য কোনো রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা গঠনেও একক কোনো উপাদান কাজ করেনি। এদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে আছে ঐতিহ্য, ইতিহাস, ভূ-প্রকৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মের সমন্বিত উপাদান। ভারতের কেন্দ্রে যখনই রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে কিংবা ভেঙে পড়ে তখনই কেন্দ্রীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে সবার আগে বিদ্রোহ দেখা দেয় বাংলায়। সুলতানী, মোগল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের আরোপিত জাতীয়তাবাদের পরিচয় বর্জন করে এদেশের মানুষ নিজেদের 'স্বতন্ত্র' পরিচয় মূর্ত করে তোলে। এর পেছনে ইসলাম, হিন্দু

ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের উপাদানগুলো কাজ করে। তবে এরপরও সবচেয়ে বড় একটি উপাদান হিসাবে কাজ করে ভাষা।

ভাষার অভিন্নতাই জাতীয়তাবাদী মানস গঠনের একক উপাদান হিসাবে কাজ করে না। ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার জনগণের মুখের ভাষা ইংরেজি। কিন্তু জাতিসত্তার পরিচয়ে তারা যথাক্রমে ইংরেজ, অস্ট্রেলিয়ান ও আমেরিকান। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভারতীয়। আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষা আরবি। কিন্তু তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় পরিচয়। মুসলমান ও খ্রিস্টান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্র গঠন করেছে। ধর্মীয় পরিচয়ে তারা মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান হলেও তাদের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিচয় রয়েছে। খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ ইংরেজ, কেউ ফ্রেন্স, কেউ আফ্রিকান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ মিসরীয়, কেউ পাকিস্তানী, কেউ বাংলাদেশী। বৌদ্ধদের মধ্যে রয়েছে বর্মী, সিংহলি কিংবা জাপানি।

উপমহাদেশের রাজনীতি ধর্মীয় খাত ধরেই প্রবাহিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের আগেও উপমহাদেশে ছিল বৌদ্ধ-হিন্দু সংঘাত, মুসলমান-হিন্দু সংঘাত। ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশের রাজনীতি মুসলমান ও হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকরা ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির মাধ্যমে ভারত শাসন করেছে। তারা জন্ম দিয়েছে মুসলমান-হিন্দু সংঘাত।

সুলতানী ও মোগল আমলে মুসলমানরা ছিল শাসক। হিন্দুরা ছিল শাসিত। তাই তারা মুসলমান শাসকদের ঘৃণা করত। ইংরেজ আমলে মুসলমানরা ক্ষমতাচ্যুত হয়। তাই তারা ইংরেজদের ঘৃণা করতে শুরু করে। মুসলমানদের পতনে আনন্দিত ছিল হিন্দুরা। তারা ইংরেজদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করে। এ কারণে ঊনবিংশ শতকে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল।

ইংরেজ আমলে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কলেবর বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে জন্ম নেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। মধ্যবিত্ত হিন্দু প্রাধান্যের জন্য তাদের জাতীয়তাবাদের দর্শন হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। শিক্ষা-দীক্ষায় পেছনে পড়ে থাকা মুসলমানরা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের আদর্শ খুঁজতে থাকে। উনিশ শতকের শেষ দশকে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানদের যে জাগরণ ঘটে, সে ঢেউ বাংলার মুসলমান সমাজে এসেও লাগে। সৈয়দ আহমদের অনুপ্রেরণায় মুসলমানরা ব্রিটিশ বিরোধিতা ত্যাগ করে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়। এর ফলে বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্প্রসারিত হয় এবং তাদের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে জাতীয়তাবাদী চেতনা। নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অন্বেষণে তারা ব্রতী হয়। ব্রিটিশ শাসকদের দেশ

শাসনের নীতি থেকে জন্ম নেয় ধর্মীয় চেতনা সমৃদ্ধ জাতীয়তাবাদের দুটি ধারা। ১৯০৫ সালে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে বঙ্গবঙ্গ করে দুটি ধারাকে উস্কে দেয়। হিন্দু ভূ-স্বামীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুসলমানরা বঙ্গবঙ্গকে সমর্থন করে। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বঙ্গবঙ্গ নীতির বিরোধিতা করায় পূর্ব বাংলার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের মুসলমান প্রধান এবং হিন্দু প্রধান এলাকাগুলো নিয়ে ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করে।

মোগল আমলে বাংলাদেশের সম্পদ চলে যেত দিল্লীতে। ইংরেজ আমলে তা চলে যায় কলকাতায়। পাকিস্তান হবার পর পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে গড়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানের চোখ ঝলসানো রাজধানী ইসলামাবাদ। পাকিস্তান শাসকরা শুধু সম্পদ পাচার করেই সন্তুষ্ট থাকেনি, তাদের দুঃশাসনে পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বাঙালিরা নিজেদের ভাষাগত পরিচয়কে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছে স্বায়ত্ত শাসনের দিকে। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা বাংলাদেশকে সম্পদ পাচারের পশ্চাৎভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেয়নি। বরং ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারায় জনগণ নিজেদেরকে একটি স্বাধীন জাতি রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে।

বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীন হলেও তাদের মনোজগত এবং চিন্তার জগতে বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। এর ফলে তারা বার বার অতিরিক্ত অতীতাশ্রয়ী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ নামে জাতি-রাষ্ট্রের কথা বিস্মৃত হয়। অনেকে নিজেকে বাঙালি অভিধায় চিহ্নিত করে। এর একটি বিকৃত রূপ দাঁড় করানো হয়। অনেকেই ঊনিশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য ভুলে যায় এবং বাংলাদেশী শব্দের অর্থ শেকড় থেকে নির্মূল করে দিতে চায়। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ, প্রত্যেক জাতিরই একটি জীবন্ত জৈবিক কাঠামো থাকে, যার মর্মমূলে প্রোথিত থাকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দর্শন। এ দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এদেশের জনগণ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের পরিচয় ছিল বাঙালি। কিন্তু এদেশের মানুষ তা গ্রহণ করেনি। তাই পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালির পরিবর্তে বাংলাদেশী শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাদেশের প্রচলিত বানান 'বাঙলাদেশ' পরিহার করা হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের 'বাঙলা' কিংবা 'বাঙলাদেশ' বানানের

পার্থক্য সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলো সাংবিধানিক শব্দের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংবিধানিক শব্দের বানান ও পরিভাষা পৃথক। যেমন-পরিচালক-অধিকর্তা; জাতীয় সংসদ-লোকসভা; লোকতন্ত্র-গণতন্ত্র; মীনক্ষেত্র-মৎস্যক্ষেত্র; এটর্নি জেনারেল-মহান্যায়বাদী; পিটিশন-যাচনপত্র ইত্যাদি। এদেশের মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গের অনেক শব্দের অর্থই বোধগম্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দর্শনে বিশ্বাস করে। এ কারণে তাদের নাগরিকত্বের পরিচয় ভারতীয়। তাছাড়া বাঙালি পরিচয়টি রাষ্ট্রীয় নয়, নৃ-তাত্ত্বিক। পরাধীন দেশেও মানুষের নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থাকে। স্বাধীন দেশের মানুষের থাকে সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, আত্মপরিচয়ের গৌরববোধ এবং মানবসত্তার অধিকার। শুধু ভাষার পরিচয়ে যেমন জাতি-রাষ্ট্র হয় না, তেমন জাতীয়তাবাদও হয় না। বিশ্বের বহু দেশেই একাধিক ভাষার মানুষ রয়েছে। ভারত স্বাধীন হবার পর সে রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা হয় ইংরেজি ও হিন্দি। কিন্তু তারা ইংরেজ নয়। চারটি ভাষাভাষী সুইসরাও একটি জাতি। নাইজেরিয়ায় রয়েছে দেড় শতাধিক ভাষা। অপরদিকে ইংরেজি, আরবি ও কোরীয় ভাষাভাষী মানুষ নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে একাধিক রাষ্ট্রে বসবাস করে।

ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাংলাদেশের সকল মানুষ বাঙালি নয়। বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী নরগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে চাকমা, সঁওতাল, মনিরপুরি, গারো, মোরাং, মারমা, ত্রিপুরী, হাজং, খাসিয়া, রাখাই, রাজবংশী, ওরাং, লুসাই, তাঞ্চঙ্গা, খুমি ইত্যাদি। তারা বাঙালি না হয়েও বাংলাদেশী। এসব জাতিগোষ্ঠি ঊনিশ শ একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা, জাতীয় সংসদ স্থগিতকরণ, পাকিস্তানের সামরিক সরকার কর্তৃক জনগণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা, গণহত্যা সংঘটন ইত্যাদি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ। স্বাধীনতা ঘোষণার সনদপত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।' বাংলাদেশের মানুষ অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-অবিচার ও বৈষম্য থেকে মুক্ত হবার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। এ কারণে সুবিচারের আদর্শসমূহ বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে "আমরা যাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা লাভ করতে পারি সেই জন্য বাংলাদেশের

জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।" বাংলাদেশের সংবিধানে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য হ্রাস, কৃষির বিকাশ, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের উৎপাদন সংস্কৃতির সঙ্গে বিনোদনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তারা গান গেয়ে ধান কাটে, দাঁড় টানে, গরুর গাড়ি চালায়, পাথর ভাঙে, কাঁথা সেলাই করে, চারা রোপণ করে কিংবা উদাসী বাউল হয়ে ঘরছাড়া হয়। সুরের তারে বাঁধা তাদের মন। এদেশের নিসর্গ মানুষকে ভাবুক করেছে, কিন্তু কর্ম বিমুখ করেনি। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মতোই ভেঙেছে তাদের রাষ্ট্র, সমাজ-সংসার, ঘর-বাড়ি। কিন্তু তা বিলীন হয়ে যায়নি। বরং তাদের জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে। নদীর তীরের মানুষ প্রবল বর্ষার সময় নদীর সঙ্গে লড়াই করে। আবার সে নদীর গভীর থেকেই তুলে আনে রূপালি সম্পদ। তাদের দু চোখ ইলিশের স্বপ্নের আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বাংলাদেশের মানুষের মনে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধশালী করার প্রচেষ্টা সব সময়েই ছিল। আর বাংলাদেশ সৃষ্টির পর একে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে স্বাধীনতার পরপরই শুরু হয়েছে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে নতুন সংস্কৃতি নির্মাণের আয়োজন। এ আয়োজনের পেছনে রয়েছে জাতি-রাষ্ট্রের নিঃসংশয় অস্তিত্ব।

একটি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হয় সে দেশের রাজধানী থেকে। এ কারণেই সারা দেশের মানুষ নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য চেয়ে থাকে রাজধানীর দিকে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হবে ঢাকা।

শত শত বছর ধরে উপমহাদেশের কেন্দ্রভূমি হিসাবে বিবর্তিত হয়েছে দিল্লী। দিল্লীর ইতিহাস সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে আলোড়িত হয়েছে অসংখ্য বার। সম্রাট ও রাজ-রাজাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে দিল্লীর সিংহাসন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঢাকা ততটা গভীরভাবে আলোড়িত হয়নি। ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস ঢাকা পড়ে আছে অবলুপ্ত স্মৃতির তমসায়। একইভাবে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসও তমসাচ্ছন্ন। এমনকি কোনো কোনো পৌরাণিক বীর কিংবা ঐতিহাসিক নায়ক বাঙালির মননের গভীরে প্রোথিত হয়নি।

মানুষের সবচেয়ে স্থায়ী শ্রমের ফসল হচ্ছে তাদের ভাষা। বাংলা ভাষার পরিচয়ে মুসলমান-হিন্দু-খ্রিস্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একটি জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছে। তাদের আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এ কারণেই বাঙালির সংগ্রাম ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। এর মূল উপাদান ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, মৌলিক মানবাধিকার এবং সুবিচারের আদর্শ। আদিবাসী জনগোষ্ঠীও একই বোধ দ্বারা তাড়িত হয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুধু বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ছাড়াও অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন আদিবাসী। তাদের আদিবাসী মূল্যবোধ বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যোগ করেছে বহুমাত্রিক উপাদান। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে 'বাঙালি' শব্দের স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে 'বাংলাদেশী' শব্দটি। সম মর্যাদার অনুভূতিকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের ২ দফায় বলা হয়েছে 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।'

বাংলাদেশের সকল মানুষ একটি অভিন্ন সংবিধানের অধিকারী। একক সত্তা বিশিষ্ট বাংলাদেশের অধীনে কোনো প্রদেশ নেই। এদেশের নাগরিকরা এক সমধর্মী সংস্কৃতির অংশীদার। বাংলাদেশ হচ্ছে একটি প্রজাতন্ত্র। এদেশের মানুষের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের পরিচয় বাংলাদেশী। বাংলাদেশের রয়েছে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, ভাষা, জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক। এদেশের জাতীয় প্রতীক হচ্ছে ধানশীষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান শাপলা। তার শীর্ষদেশে পরস্পর সংযুক্ত পাটগাছের তিনটি পাতা। এর উভয় পাশে রয়েছে দুটি করে তারকা। এসব উপাদান হচ্ছে স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক। বাংলাদেশ রাষ্ট্র সকল বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করেছে। এ রাষ্ট্রের প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় হচ্ছে কর্ম। বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক শ্রমসহ সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াস ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দর্শনে এসব অঙ্গীকারই ব্যক্ত হয়েছে।

কৃত্য ও থিয়েটার

প্রাচীনকালে মানুষ ছিল শক্তির পূজারি। অগ্নি কিংবা বৃক্ষ ছিল তাদের উপাস্য। এর পেছনে তারা কল্পনা করেছে শক্তিকে। তাই গ্রিক ট্র্যাজেডিকে বলা হয়েছে কৃত্য। ধর্মীয় নাটককে পাশ্চাত্যে বলা হয় 'প্যাশান প্লে'। এ্যারিস্টটল নাটককে বলেছেন 'কাজের অনুকরণ'। আর তা শুরু হয়েছে প্রস্তর যুগ থেকে। গ্রিক নাটকের মধ্যে রয়েছে গল্প, সংলাপ ও চরিত্রের বলিষ্ঠতা। গ্রিসের আগে খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে মিশরে অভিনীত হতো নাটক। রাজা ওসিরিসের কাহিনী নিয়ে অভিনীত নাটকটি হচ্ছে নাটকের সূচনা পর্বের একটি স্তম্ভ।

মিশরীয়রা ষাঁড়কে ওসিরিসের বিকল্প মূর্তি হিসাবে মনে করত। এ ষাঁড়ের নাম ছিল 'এপিস'। সাতদিন ধরে এর পূজা করা হতো। ষাঁড়টি মারা গেলে আরেকটি চমৎকার ষাঁড় এনে পূজা করা হতো। তখনকার মিশরীয় জনগণ এই জীবিত ষাঁড়টিই মনে করত পুনর্জীবনপ্রাপ্ত ষাঁড়। অর্থাৎ ওসিরিসের মৃত্যু এবং পুনর্জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করা হয়েছে এ নাটকে।

আদিতে নাটক কৃত্য সর্বস্ব ছিল। মিশর, গ্রিস ও ভারত উপমহাদেশের নাট্য সূচনার ইতিহাস সে কথাই বলে। অবশ্য গ্রিসের দিওনিসুস উৎসব গ্রিক ট্র্যাজেডি ও কমেডির দ্বি-ধারায় বিকশিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে ট্র্যাজেডি ও কমেডি বিকশিত হলেও গ্রিক ট্র্যাজেডি শেষ পর্যন্ত কৃত্যেরই কন্যা।

প্রাচীন গ্রিসে পাহাড়ের পাদদেশে পাথর কেটে কেটে নির্মাণ করা হতো দর্শকদের আসন। মাথার উপর ছাদ ছিল না। কয়েক দিনের উৎসবের ক্লান্তি শেষে ভোরের নরম রোদে অভিনীত হতো নাটক। পেছনের দিকে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত পাহাড়ের প্রাচীর। সে নাটকের কাহিনীতে ছিল বীরত্বের মহিমা ও বিপর্যয়। যুদ্ধ ও ভাস্কর্যপ্রিয় রোমানদের পক্ষেও সেই বীরত্বের অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

মিথ হচ্ছে আদিম মানুষের স্বপ্ন, কল্পনা ও কৃত্যের সমষ্টি। চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন খচিত আকাশ, ঋতুর ঘূর্ণনশীলতা, জীবন ও মৃত্যুর জটিল রহস্যের এক আদিম ব্যাখ্যা হচ্ছে মিথ। কৃত্য তার অন্যতম উপাদান। এর সৃষ্টির সঙ্গে রয়েছে আদিম মানবের জীবন ও জীবিকার যোগসূত্র। ধর্মঠাকুরের কৃত্যের কোথাও কোথাও শ্বেত কপোত কিংবা আজবলির ব্যবস্থা রয়েছে। ধর্মঠাকুর শিবের আঞ্চলিক সংস্করণ।

দুপুরের সূর্যের বর্ণ শুক্ল। সুতরাং শুক্ল বর্ণের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সাযুজ্য রয়েছে। অন্যদিকে ধর্মঠাকুর কুষ্ঠরোগ নিরাময়কারী শক্তি। এ রোগ নিরাময়ে সূর্যকিরণ একটা প্রধান নৈসর্গিক অনুষঙ্গ, তা প্রাচীনকাল থেকেই পরিজ্ঞাত। ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্যের চেয়ে নৃত্যই বেশি কৃত্যমুখি। আধুনিককালে থিয়েটারে কৃত্য নেই। তবে তাতে ধর্ম ও পুরাণের স্পর্শ আছে। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারায় আছে বাঁধ ভাঙার শক্তি ও সাধনা, বিসর্জনে আছে পুরোহিত ও রাজার সংঘাত। শুষ্ক তৃণের অন্তরে যেমন নীলাভ অগ্নি জ্বলে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তেমনি আধুনিক নাটকে থাকে বিক্ষোভ। কাজেই আচারজনিত কৃত্যের উদ্ভাসন থাকে না সেখানে।

সেলিম আল দীন একটি মারমা রূপকথা রচনার সময় কৃত্যের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি এর মাধ্যমে রচনা করেছেন নতুন টীকাভাষ্য। তিনি বলেন, 'একটি মারমা রূপকথা নির্বাচনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং মারমাদের প্রতি যে রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া।' এ রূপকথার মধ্যেই প্রতীকার্থে নিহিত রয়েছে মারমাদের জীবনের কৃত্য এবং সংগ্রাম। তাদের সংগ্রামের ফলেই স্বর্গ নেমে এসেছে মর্ত্যে। এটি হচ্ছে একটি ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানী জাতির রূপকথা।

জাতিতত্ত্বের আলোকে সেলিম আল দীনের 'কেরামত মঙ্গল' নাটকে হাজং ও গারো নৃত্য, 'চাকা' নাটকে রাজশাহী ও দিনাজপুরের সাঁওতাল জীবনের চিত্র

রয়েছে। 'যৈবতী কন্যার মন' নাটকে রয়েছে মারমাদের অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু 'একটি মারমা রূপকথা' সামগ্রিক অর্থেই উপজতীয় থিয়েটার। পাশ্চাত্য রীতির অভিনয় হচ্ছে চরিত্র কেন্দ্রিক। কিন্তু একটি মারমা রূপকথা নাটকে তা পরিহার করা হয়েছে। নাটকটি বদলি অভিনয় রীতির আশ্রয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। ঢাকা থিয়েটার 'কেরামত মঙ্গল' নাটকের মাধ্যমে এ রীতির প্রবর্তন করেন। এ নাটকে পর পর তিনজন কেরামত চরিত্রে অভিনয় করেন।

মাত্র নব্বই মিনিটের পরিধিতে 'একটি মারমা রূপকথা' নাটকের মাধ্যমে মারমাদের কৃত্য, আচার, শ্রমণ, বিবাহ, ধর্মবিশ্বাস, স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সেলিম আল দীন একেই বলেছেন, 'এথনিক থিয়েটার'। এ নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে পাঙ্খু নৃত্য। পাঙ্খু ধীর লয়ের নাচ। সেলিম আল দীন বলেন, 'এ নাচে কাঁধ, নিতম্ব, বসা অবস্থায় হাঁটু এবং হাতের সাধারণ সঞ্চালন হয়। এতে রয়েছে কতকগুলো সীমিত ভঙ্গি। এ নাচ এক অপরিচিত শিল্প শস্যের সন্ধান দেয়।' মারমা কুমারীদের পাঙ্খু সুরে কেঁপে ওঠে অরণ্যের আলোছায়া, পাহাড়ের চূড়ায় চাঁদ, বসন্তরাতের রহস্য। পাঙ্খুর সুরের দোলা বাংলা গানেও লেগেছে। নাটকের দুটি গানে বসন্তবাহার ও ভীম পলশ্রী রাগে সুরারোপ করা হয়। এ দুটি গান বাংলায় রচিত হবার পর মারমা ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। পাঙ্খুর ধীর লয়ের জন্য তা ক্লান্তিকর মনে হতে পারে। এ জন্য মারমাদেরই অন্য একটি সম্প্রদায়ের 'জ্যাঃ' নৃত্যকে এর সঙ্গে মিলানো হয়েছে। 'জ্যাঃ' অধিকতর লীলা চঞ্চল নৃত্য।

লৌকিক দেব-দেবী এবং পীর-ফকিরের অলৌকিক জীবন কাহিনীকে ভিত্তি করে এ দেশে কৃত্য নাটকের চর্চা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে গাজী গানের কথা বলা যেতে পারে। এমনকি প্রাচীন বাংলা কবিতা চর্যাপদেরও রয়েছে কৃত্য নাটকের উপাদান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ ও রাধার জন্মকথা ধর্মকথারই অংশ। কৃত্য ও ধর্মের প্রভাবে অজস্র নাট্য উপাদানের প্রবাহ বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানবিক চেতনায় স্ফুরিত হয়েছে। সেই চেতনাপ্রবাহ আধুনিক নাট্যধারা থেকে অজান্তেই ছিন্ন হয়ে গেছে। সমাজ সচেতন ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা নাটক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকে এসেছে কঠিন বাস্তবতা, মূল্যবোধের সংঘাত এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের চাক চাক জ্বলন্ত অঙ্গার। ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক সেলিম আল দীনের লেখা প্রথম মঞ্চস্থ (১৯৭৩) নাটক 'সংবাদ কার্টুন'। ঢাকা থিয়েটার কর্মীরাই নাটকটিকে বলেছেন রিপোর্টাজ। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়লে যে খবর চোখে পড়ত, তারই শিল্পসম্মত

উপস্থাপনা ছিল 'সংবাদ কার্টুন'। 'সংবাদ কার্টুন' নাটক মঞ্চায়নের সময় ঢাকা থিয়েটার বলেছিল, 'কোনো রাজনৈতিক শ্লোগান আমাদের নেই। তাই বলে রাজনৈতিক অসচেতন নই আমরা।' সংবাদ কার্টুনের শুরুতেই ঘোষক ঘোষণা করেছে, 'এই ঢাকা শহর। জ্বী হ্যাঁ, কালোবাজারী, চোরাকারবারীর শহর, মুনাফাখোর, মজুতদারের শহর, হাইজ্যাকার, ব্যাঙ্ক লুটেরা ও নকলবাজের শহর। ঢাকা শহর।'

উনিশ শতকে বাংলা থিয়েটারের শুরু হয়েছিল ইংরেজি নাটকের অনুকরণে। বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা এসেছিল প্লে-হাউজ, ক্যালকাটা থিয়েটার, মিসেস বিস্ট্রোর থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যশালা থেকে। তখন এসব মঞ্চে অভিনীত হতো ইংরেজি নাটক। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও ছিলেন ইংরেজ, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান। দর্শক ছিলেন মূলত তারাই। কলকাতা কেন্দ্রিক থিয়েটারের বাইরে পাঁচালি, যাত্রা গান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, গম্ভীরা, কবিগান, কথকতা ইত্যাদি সাধারণ বাঙালি দর্শকদের বিনোদনের উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজে একটি রুচির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তারা বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে থিয়েটারকে গ্রহণ করেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম নাটক মঞ্চায়নের কৃতিত্ব অর্জন করেন একজন রুশ দেশীয় পর্যটক ও বণিক হেরেহিস লেবেডফ। তিনি ১৭৫৯ সালে মঞ্চস্থ করেন 'দি ডিসগাইস' এবং 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' নামে দু'টি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ। ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে গান সংগ্রহ করে এ নাটকে পরিবেশন করা হয়েছিল।

বাঙালির উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয় কলকাতার শ্যাম বাজারের নবীন বসুর বাড়িতে, ১৮৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর। নাটকের নাম বিদ্যাসুন্দর। এরপর বাংলা নাটক বিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন ধারায়। কিন্তু এর নিজস্ব ধারা গড়ে ওঠেনি। বাংলা নাটকের আঙ্গিকে ইংরেজি নাটকের প্রভাব পড়লেও রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গল কাব্যের বহু উপাখ্যানই বাংলা নাট্যকারদের গ্রাস করে। তারা নিজস্ব বিষয়বস্তু উপহার দেন ইংরেজি রীতিতে। তবে বাংলা প্রহসন নাটকে সামাজিক বাস্তবতাও স্থান পায়।

ঊনবিংশ শতকেই কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের ঢেউ এসে লাগে বাংলাদেশে। ১৮৭১ সালে গঠিত হয়েছিল 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার'। তাদের প্রদর্শিত নাটকের নাম ছিল 'শরৎ সরোজিনী', 'মেঘনাদ বধ' ও 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক'। ঢাকায় এরপর বহু গ্রুপ থিয়েটার গড়ে উঠেছিল; কিন্তু নাট্য

বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় বাংলা নাটকের দেশজ প্রবাহটি সৃষ্টি হয়নি। এমনকি ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ড্রামা সার্কলও বাংলা নাটকের প্রকৃত ধারা সম্পর্কে সচেতন ছিল না।

১৯৭২ সালে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শুরু হয় প্রকৃত গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন। নাটক মঞ্চায়ন শুরু করে নাগরিক, ঢাকা থিয়েটার, থিয়েটার, আরণ্যক, নাট্যচক্র, বহুবচন, পদাতিক, ঢাকা পদাতিক ইত্যাদি গ্রুপ থিয়েটার দল। তারা মঞ্চে নিয়ে আসে নতুন নতুন নাটক। ঢাকা থিয়েটার গঠন করে গ্রাম থিয়েটার এবং আরণ্যক শুরু করে মুক্ত নাটক আন্দোলন।

শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে গ্রাম কেন্দ্রিক নাট্য চিন্তার শুরু হয় চীনের অভিজ্ঞতা থেকে। চীনে যখন জাপানি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য গ্রামে গ্রামে গণপ্রতিরোধ শুরু হয়, তখন গ্রামের লোকের সামনে দেশ-প্রেমমূলক নাটক মঞ্চায়নও ছিল গণপ্রতিরোধের অংশ। এ ধরণের নাটক মঞ্চায়ন জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের মনে সৃষ্টি করে প্রতিরোধের সাহসী চেতনা।

৪৩-এর বাংলার মন্বন্তর বাঙালি লেখকদের মনে যুগিয়েছে প্রতিবাদী নাটক লেখার প্রেরণা। তখন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোষণের প্রতিবাদে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয় বিজন ভট্টাচার্যের প্রতিবাদী নাটক 'আগুন' ও 'জবানবন্দী'। 'জবানবন্দী' নাটকের একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন একজন দরিদ্র কৃষক। তার নাম পরান মণ্ডল। এরপরই ১৯৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবরে ভারতীয় লোক নাট্য সংঘের উদ্যোগে অভিনীত হয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক 'নবান্ন'।

অবিভক্ত বাংলায় নাট্য আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। আর তখন ঢাকায় জন্ম নিয়েছে শুধুই পেশাদারী নাট্য দল। ৪৩-এর মন্বন্তর এখানে জয়নুল আবেদীনের মতো মহান শিল্পী জন্ম দিয়েছে; কিন্তু কোনো গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের জন্ম দেয়নি। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে বাংলাদেশের নাট্য চর্চার নতুন ধারা। সত্তর দশকে নাট্য চর্চার প্রক্রিয়াটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, অনেকাংশে সয়ম্ভূ।

সত্তর দশকে বেশ কয়েকটি নাটক দর্শক নন্দিত হয়েছে। এ সাফল্যের মূলে যতটা না শৈল্পিক উৎকর্ষ ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল চমক। সত্যিকার

অর্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নাট্য চর্চার মধ্য দিয়ে দর্শক মহলে নাটক ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। ১৯৭২ সালে নাট্য প্রতিযোগিতায় মহসিন হল থেকে 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' প্রথম পুরস্কার পায়। নাটকটির নাট্যকার ও নির্দেশক ছিলেন যথাক্রমে সেলিম আল দীন ও নাসির উদ্দিন ইউসুফ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় যথাক্রমে এস এম হলের 'রোলার ও নিহত এল এম জি' এবং রোকেয়া হলের 'রঙহীন সিগন্যাল'। নাট্যকার ছিলেন যথাক্রমে আল মনসুর ও আক্তার কমল। এর মধ্য দিয়েই নাটক ছাত্রদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

১৯৭৩ সাল থেকেই দর্শনীর বিনিময়ে দর্শকরা নাটক দেখতে শুরু করেন। পারাপার ও বহুবচন নাট্যগোষ্ঠী প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চস্থ করে। পারাপারের সে সময় প্রদর্শিত নাটক ছিল কবীর আনোয়ার কর্তৃক লিখিত 'জনে জনে জনতা'। ফরহাদ মজহারের লেখা বহুবচন প্রযোজিত নাটকের নাম ছিল 'প্রজাপতি লীলা লাস্য'।

নাটকের আদি রূপ কাব্য। কাব্য ও দৃশ্যকাব্য বিকশিত হয়েছে নিজের ধারা মতো। নাটককে বলা হয় দৃশ্য কাব্য। কারণ এর ভেতর কাঠামো দৃশ্য নির্মাণের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়। এ জন্য প্রয়োজন সংগতি ও অসংগতির দ্বন্দ্ব থেকে এর বিষয়বস্তুর ঐক্য সূত্রকে উন্মোচন করা। সত্তর দশকের দর্শক নন্দিত নাটকগুলো অনেকাংশে সে দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে এ কারণে, নাটকে নাট্যগুণ রক্ষিত হয়নি- যা অন্তঃসলিলা প্রবাহের মতো জীবনকে টেনে নিয়ে যেতে পারে আলো ও সম্ভাবনার দিকে। বরং নাটকে সৃষ্টি হয়েছে চমকের আতিশয্য। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাটকগুলো সমাজ ও জীবন সম্পর্কে সত্য উচ্চারণে ব্যর্থ হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রাচীন ও আধুনিক নাটকগুলোর মহত্তম অভিব্যক্তি যেখানে ট্র্যাজেডিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে, সেই ট্র্যাজেডির বিয়োগান্তক বীরত্ব গাঁথা আমাদের দেশের নাটকে ছিল অনুপস্থিত। আধুনিক সভ্যতা ও মূল্যবোধের ভেতরে যে ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়েছে, সেই অবক্ষয় ফোঁপরা করে দিয়েছে আমাদের সমাজ ও মূল্যবোধকে। আর নতুন সংগ্রামে সমবেত হয়েছে সাধারণ মানুষ। এর প্রভাব পড়েছে নাটকে।

সত্তর দশকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের 'সৎ মানুষের খোঁজে' অনুবাদ নাটকের মঞ্চায়ন। আলী যাকের ব্রেখটের 'দি গুড ওম্যান অব সেটজুয়ান' নাটকের বাংলা রূপান্তর করেছেন 'সৎ মানুষের খোঁজে'। এ নাটকের নির্দেশকও ছিলেন তিনি। 'প্রভু' চরিত্রে অভিনয়ও

করেছেন। কবিতার মাধ্যমে এদেশের পাঠকদের কাছে ব্রেখট কিছুটা পরিচিত হয়েছেন। এদেশে ব্রেখট নাট্যকার হিসাবে মূলত পরিচিত হয়েছেন 'সৎ মানুষের খোঁজে' ও 'দেওয়ান গাজীর কিসসা'-এ দু'টো নাটকের মাধ্যমেই। কেউ কেউ তার নাটকের আগ্রহী পাঠক থাকলেও দর্শক ছিল না। দর্শক সৃষ্টির কৃতিত্ব নাগরিকের একার। কোনো প্রচলিত নাট্যতত্ত্বে ব্রেখটের আস্থা ছিল না। তিনি মনে করতেন নাটক ও দর্শকদের মধ্যে রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট প্রাচীর। নাটক নাটক-ই, বাস্তবতা নয়। গ্রিক নাট্যধারার 'এপিলগ'-কে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

সত্তর দশকে মঞ্চস্থ ঢাকা থিয়েটারের সবকটি নাটকই ছিল মৌলিক। এর মধ্যে 'শকুন্তলা' ও 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী' উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে। এ দুটো নাটকই সেলিম আল দীনের লেখা। তার ভাষা ক্লাসিক ও কাব্যিক। কিন্তু বিষয়বস্তু রোমান্টিক। আর এ রোমান্টিকতার কারণেই তার নাটকে কল্পনা যতটা সুদূর প্রসারী, বাস্তবতা ততটা নয়। ফলে তার নাটকের বিশিষ্ট উপাদান হিসাবে কাজ করে 'ক্যাথারসিস'। অভিনেতা তার বাস্তব চরিত্র থেকে নিজেকে বিস্মৃত হতে বাধ্য হন, ব্রেখটের নাটকে তা মূল্যহীন।

মমতাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল্লাহ আল মামুন ষাট দশকের নাট্যকার। তাদের বিকাশের পর্ব ছিল মূলত সত্তর দশক। মমতাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীনতা উত্তর নাট্য জগতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তার রচিত 'ফলাফল নিম্নচাপ' 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা' ও 'হরিণ চিতা চিল' সত্তর দশকের সাড়া জাগানো সফল মঞ্চ নাটক।

থিয়েটারের বেশির ভাগ নাটকের নির্দেশক ও নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন। তার লেখা 'এখন দুঃসময়' 'সুবচন নির্বাসনে', ও 'সেনাপতি' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমকালের পটভূমিতে তিনি তার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরেন। তার নাটক সংলাপমুখর। কাহিনী না যতটুকু বিস্তৃত তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত চরিত্রগুলোর ভেতরের তাত্ত্বিকতা। অর্থাৎ বাস্তবতার সংস্পর্শে তার নাটকগুলো নির্মিত হলেও বেশির ভাগ চরিত্রই থিওরিটিক্যাল।

সত্তর দশকে আতাউর রহামন নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত 'ভেঁপুতে বেহাগ' ও 'মাইল পোস্ট' নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন। ফেরেঞ্চ মলনারের 'ভেঁপুতে বেহাগ' নাটকটি আসাদুজ্জামান নূরের সহযোগিতায় অনুবাদও তিনি করেন। আসাদুজ্জামান নূর 'মাইল পোস্ট' ও 'সাজাহান' নাটকে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়ান।

অভিনেতাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন রাইসুল ইসলাম আসাদ ও আফজাল হোসেন। ঢাকা থিয়েটারের 'শকুন্তলা' নাটকে তাদের দু'জনের অভিনয়ই ছিল অনবদ্য। এ ছাড়া 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী'র নাম ভূমিকায় অভিনয় করে সুজা আহমদ যথেষ্ট সুনাম কুড়ান।

স্বাধীনতার পর পর যে কটি নাট্যদল দর্শক সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেছে, তার মধ্যে 'আরণ্যক' অন্যতম। এ দলের উল্লেখযোগ্য নাটক ছিল 'পশ্চিমের সিঁড়ি', ও 'গন্ধর্ব নগর'। আরণ্যকের সর্বাধিক প্রদর্শিত নাটক ছিল 'ওরা কদম আলী'। নাটকটির কাহিনী একজন নির্বাক মানুষের মর্মবেদনা নিয়ে গড়ে উঠেছে। 'ওরা কদম আলী'র নাট্যকার মামুনুর রশীদ।

বাংলা নাটকে নায়িকা সংকট কখনই কাটেনি। ১৮৭৯ সালে 'ন্যাশনাল' থিয়েটার প্রযোজিত 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'চক্ষুদান' নাটক দুটোতে অভিনয় করেন কয়েকজন বারবণিতা। এরাই ঢাকায় অভিনীত নাটকে প্রথম মহিলা অভিনেত্রী। তখন ভদ্র সমাজের কোনো মহিলাই নাটকে অভিনয় করতেন না। সত্তর দশক থেকে ভদ্র পরিবারের লোকেরা নাটককে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেন।

হাত হদাই

লোকজ সংস্কৃতির আধুনিক রূপান্তর

যুদ্ধ করা আর যুদ্ধের অভিনয় করা এক কথা নয়। তবু নাটকের মাধ্যমে মানব জীবনের রক্ত ক্ষরণের দাগ এমনভাবে তুলে ধরা হয়, যার মধ্যে থাকে সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। চরিত্র ও গল্পের সংশ্লেষণে নাটকের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় তার বিষয়বস্তু। কিন্তু কোনো নাটকই মঞ্চায়নের সাফল্য ছাড়া কালোত্তীর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ একজন নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য পাঠক নয়, দর্শক। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত 'হাত হদাই' একটি মঞ্চ সফল নাটক।

'হাত হদাই' কথাগুলো নোয়াখালীর আঞ্চলিক শব্দ। এর অর্থ 'সাত সওদা'। নাটকটি নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রামের ঘটনাবহুল চিত্র তুলে আনা হয়েছে নাটকে। ঢাকা থিয়েটার মনে করে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উপকূলীয় মানুষের ভাষা বেশি গদ্যধর্মী। কিত্তন খোলার ধ্রুপদী রূপান্তরবাদ এবং কেরামত মঙ্গলের লৌকিক বিশ্বাসকে তুলে এনে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংশ্লেষণ করা হয়েছে।

আর 'হাত হদাই' নাটকের মধ্যে আরব্য রজনীর গল্পের কাঠামোকে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রিত করা হয়েছে। তবে এখানে জীবন দর্শনে রয়েছে প্রাচ্যরূপ।

'হাত হদাই' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনার ভান্ডারী। তার মনের গভীরে একই সঙ্গে গর্জন করে ওঠে সমুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও মৃত্যুবোধ। তবু জীবন সংগ্রামে অপরাজেয় আনার ভান্ডারী নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করে বেঁচে থাকে। আবার কখনো বা তার জীবন ও স্বপ্নের বাস্তবে ওড়ে উজ্জ্বল বর্ণের ঘুড়ি। এর মধ্য দিয়েই আনার ভান্ডারী গোর খোদকের সঙ্গে পথযাত্রা শুরু করে। কিন্তু সে তার মনের অবচেতন স্তর থেকে সমুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মুছে ফেলতে পারে না।

'হাত হদাই'-কে বাণিজ্যিক অর্থে বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে বন্দর থেকে বন্দরে যাত্রার উদ্দেশ্যকে নাটকে ব্যক্ত করা হয়েছে। মূলত তা নয়। বরং রূপকার্থে বলা যায়, অঙ্কুরীর সঙ্গে আনার ভান্ডারীর প্রণয়, হাস্নার সঙ্গে মোদুর ব্যর্থ প্রেম, নাডু গাডুই-এর কাছিম শিকার, চর দখলের দাঙ্গা, জীবন সংগ্রামে অর্জিত চুক্কুনীর অভিজ্ঞতাসহ নাটকের সকল উপাদানই হচ্ছে বাণিজ্যের অংশ। নাটকের প্রতিটি চরিত্র জীবনবাণিজ্যে নিয়োজিত। তাদের অন্তর্লীন সমুদ্রে রয়েছে অসংখ্য জাহাজের ভিড়। কাজেই 'হাত হদাই' কথাটি আংশিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। বরং সার্বিক অর্থেই প্রযোজ্য।

এ নাটকের একটি চরিত্র হচ্ছে নাডু। সে কাছিম শিকারী। তার কাছিম শিকারের ঘটনার মধ্য দিয়েই নাট্যকার আমাদের সমাজের শ্রেণী বৈষম্যের কথা বলেছেন। নাডু আনার ভান্ডারীর কাছে কাছিম শিকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেছে, 'তুই আঁরে মাফ করে দে দেবতা। তুই নারায়ণের জলের মূর্তি-জলের রাজা, তবে আঁই শিক গাঁথুম, খুন করুম। তুই আঁরে ক্ষেমা দে। দে ঠাউর আহার দে। ডর কি! তোর জন্মান্তর আছে-আমি তো নমশূদ্র, কত কষ্টে মানুষ্য দেহ ধারণ করি আছি।' এ সংলাপের মধ্য দিয়েই উচ্চারিত হয়েছে জন্মান্তরবাদ এবং বর্ণবাদের মর্মান্তিক মর্মবেদনা। এ দুটি দর্শনের শেকড় প্রোথিত রয়েছে লোক-সংস্কৃতির গভীরে।

'হাত হদাই' নাটকে কাহিনীর তুঙ্গ নেই। বরং ঘটনা বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মর্মমূলে নির্মাণ করা হয়েছে গল্প। নাটকের প্রথম পর্বেই রয়েছে একটি ঘটনার বর্ণনা। তা ক্রমাগত বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করেছে। নাটকের শুরু হয়েছে জোয়ারের আগমনে উল্লসিত মাঝিদের গান দিয়ে।

জোয়ারে ভেসে আসা একটি বিশাল ডেঙ্গুইরা পাখি শিকার করতে গিয়ে আনার ভান্ডারী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। নাট্যকার এর প্রতিক্রিয়াকে বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "দুজন লোক নামে নৌকা থেকে। ...... দরোজায় শুয়ে আছে নিঃশব্দ আনার ভান্ডারী ও বিশালাকার মহারানী ডেঙ্গুইরা পাখি। এ দৃশ্যে সবার ভেতরে গুঞ্জন ওঠে। কেউ কেউ ছুটে যায় দরোজা ধরার জন্য। সবাই এ দৃশ্যকে বিশ্বাস করতে চায় না। জোসনা গাঙ্গের কূল, পাখি ও নিঃশব্দ দেহ মিলিয়ে যে দৃশ্যটি তৈরি হয়েছে শোকার্ত চরবাসীর চোখ কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে চায় না। ... তারা শোকার্ত হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্ত গাঙ্গের ভাঙন যেন তাদের পূর্বে এত বিমর্ষ করেনি, ... ।"

সঙ্গী শিকারি ইদ্রিস জ্ঞানহীন আনার ভান্ডারীকে নিয়ে চরে অবতরণ করে। ঘাটের চা দোকানে এ খবর পাওয়া মাত্র লোকজন ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। এ বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট, আনার ভান্ডারী চরবাসীদের কাছে একজন প্রিয় ব্যক্তি। এমনকি আনার ভান্ডারীকে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ছোট বোন আঙ্কুরীও পছন্দ করে। নাটকের শেষ পর্যায়ে তা প্রণয়ে রূপ নেয়। নাট্যকার সেলিম আল দীন এ নাটকের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন এক হৃদয়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন, যে বন্ধন তাদের ঐক্য ও জীবন সংগ্রামের চেতনাকে শাণিত রাখে। মূল্যবোধ ভাঙনের প্রক্রিয়ায় ভাঙছে সমাজ ও পরিবার। কিন্তু এরপরও নাট্যকারের বর্ণিত চরের জীবনে টিকে আছে মানবিক বন্ধন এবং লোকজ উৎসবের আনন্দ।

নাটকের চরিত্রগুলো প্রাচীন বিশ্বাসকে লালন করে। কিন্তু জীবন সংগ্রামের অভিঘাতে তা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। তাই তাদের কোনো কুসংস্কার আচ্ছন্ন করে না। এমনকি চুক্কুনীর মতো একজন সাধারণ তরুণীও বার বার প্রতারণার শিকার হয়েছে। যতবার সে ঘর বেঁধেছে, ততবারই তার ঘর ভেঙেছে। মূলত 'হাত হদাই' নাটকের প্রধান ট্র্যাজিক চরিত্র হচ্ছে চুক্কুনী। জরাজীর্ণ সমাজের কালো কালিন্দীর কালো প্রবাহের মধ্যেই তার জীবনের ট্র্যাজেডির বীজ রোপিত হয়েছে। যে সমাজ ধর্মের বন্ধনে বাঁধা, সেই সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে চুক্কুনী সংশপ্তক হয়েছে। কিন্তু সে সাহসী হয়েও জীবনযুদ্ধে পরাজিত। অথচ তার কণ্ঠ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

চুক্কুনীকে তার মা বলেছে, '...... তৌবা কর খোদা খুশি অইবো।' চুক্কুনী চিৎকার করে উত্তর দেয়, 'না। জনমভর খোদারে কইছি, খোদা ঘর দিও সুখ দিও, শান্তি দিও মনে- কি দিছে, কি দিছে আঁরে। ঘর দেয় না, সুখ দেয় না-

হাঙ্গর দিছে, কুমীর দিছে।' এ কয়েকটি কথার মধ্য দিয়েই চুক্কুনীর অন্তর্গত রক্ত ক্ষরণের মর্মবেদনা উচ্চারিত হয়েছে। চুক্কুনীর আর্তনাদে যে কোনো সচেতন নাট্য দর্শকেরই শিউরে ওঠার কথা। মৃত্যু পথযাত্রী চুক্কুনীর জীবন যন্ত্রণা শুধু বিবর্ণ সমাজের রুগ্ন দশাকেই তুলে ধরেনি, সেই সঙ্গে প্রতিবাদের ভাষাকেও তুলে ধরেছে। মৃত্যুর কিছু আগে চুক্কুনি বলেছে, 'তৌবার কপালে ছেপ মারি। ছেপ মারি .. থু ... থু ...।' এই একটিমাত্র সংলাপের মাধ্যমেই নাট্যকার একটি কথা স্পষ্ট করে তুলেছেন, যেখানে ধর্মের নামে নারীরা নির্যাতিত হয়, সেখানেও নারীদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয় কল্পিত পাপের বোঝা। নারী শুধু নারী হবার অপরাধেই সামাজিক নির্যাতনের শিকার। নারীকে বলা হয় অব্যক্ত ও অস্ফুট। কিন্তু চুক্কুনী অস্ফুট ও অব্যক্ত নয়। এ ধরনের চরিত্র বাংলা নাটকে বিরল। এ চরিত্রটিকে বলা যায়, 'হাত হদাই' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ, প্রতীক চরিত্র। চরিত্রটি জীবনের হাটে-বাজারে স্বপ্ন কেনা-বেচায় ব্যর্থ।

মৃত্যুবোধে আক্রান্ত আনার ভান্ডারী কাফনের কাপড় দিয়ে পাঞ্জাবি তৈরি করেছে। তৌবা করেছে। তৌবা ভেঙেছে। মৃত মানুষের সঙ্গে তাস খেলেছে। তবু সে স্বপ্ন কেনা-বেচায় সফল; কিন্তু চুক্কুনীর মনের গভীরে নির্মিত সোনার প্রাসাদ বার বার ভেঙে গিয়েছে। এ দুই বিরোধী চরিত্রের মর্মবস্তুকে একসঙ্গে করে নাট্যকার ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি করেছেন। এ দিক দিয়ে আনার ভান্ডারীর সম্পূরক চরিত্র হচ্ছে চুক্কুনী। এছাড়া নাটকের অন্যান্য চরিত্র লুত্তা, ইদ্রিস, নাড়ু, মোদুরাও জীবন সংগ্রামে জড়িত।

নাট্যকার সেলিম আল দীন নাটকের ভাষারীতি এবং জীবনকে অদ্বৈত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ভূ-প্রকৃতির বিশেষ আবহে চিত্রিত চরিত্রগুলো সমুদ্র শাসিত হয়েও বাংলাদেশের জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং তারা জয়-পরাজয়ের লবণাক্ত স্বাদ ও বিষাদ নিয়ে জীবনের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে যায়। 'হাত হদাই' নাটকে সমুদ্র আছে, আছে নদীর ভাঙন, সুদূর মিসরের বন্দর, ভূমধ্যসাগরের চাঁদ, সুগার লোফ মাউন্টেন এবং স্মৃতির মেঘমণ্ডিত সোনার প্রাসাদ। আর এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে ঘুড়ি কাটাকাটির দৃশ্য ও ভেড়ার লড়াই। লোকজ জীবনধারার প্রবাহ থেকে তুলে আনা হয়েছে এ দৃশ্যগুলো। আনার ভান্ডারীর পরলৌকিক চিন্তার চিত্রায়ণে ব্যবহার করা হয়েছে কলেরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এক জনপদের বর্ণনা। আর তাকে মৃত্যুবোধে আক্রান্ত করে তোলে মছলন শা। অন্যদিকে নাড়ু গাড়ই-এর কাছিম শিকারের অভিনয় আনার ভান্ডারীর মনে প্রচণ্ড জীবন-শক্তি তৈরি করে। নাটকে রিলিফ ওয়ার্ক হিসাবে

এসেছে একজন শিশুর হাঁটা-চলা। আনার ভান্ডারীর গল্প বলার প্রতীকটিও রিলিফ ওয়ার্ক হিসাবে এসেছে।

বিশ্বযুদ্ধের আগে আনার ভান্ডারী ব্যাংককের এক হোটেলে পাউন্ডের যে নোটে সই করেছিল, সেই নোটই এলিনা নামের এক মেয়ের কাছ থেকে ভাংতি হিসাবে সে ফেরত পায়। এ ঘটনাটি ঘটেছে মঞ্চের বাইরে। নাটকের দর্শকরা আনার ভান্ডারীর কাছ থেকে এ ঘটনা জানতে পেরে রিলিফ ফিল করে। কারণ, ঘটনাটি আনার ভান্ডারীর অন্তর্গত স্মৃতি হিসাবে বেশ উপভোগ্য।

নাটকের একটি প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে মোদু ও হাস্নার ঘটনা। মোদুর কথা বলার ধরণ নাটকের দর্শকরা বেশ পছন্দ করে। সে ব্যাংককে রেখে এসেছে তার বিদেশী বউ মাসিনুকে। দেশে এসে মোদু হাস্নার প্রেমে পড়ে। হাস্নাও তাকে ভালোবাসে। কিন্তু তা প্রণয়ে রূপ নেয়নি। মোদু থাইল্যান্ডে ফিরে যায়। হাস্নার বিয়ে হয়। কিন্তু হাস্না অন্যের ঘর করতে রাজি নয়। বিয়ের ঘটনাকে নাট্যকার 'হাত হদাই' শব্দ দুটির মাধ্যমে প্রতীকায়িত করেছেন। এ নাটকে নদীতে চরভাঙা মানুষের আর্তনাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে ঘরভাঙা মানুষের আর্তনাদ।

ঢাকা থিয়েটারের কর্মীরা নাট্য মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব তত্ত্বকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের তত্ত্বের মূলসূত্র হিসাবে কাজ করেছে লোকজ জীবন ধারা। ১৯৮১ সালে তারা 'কিত্তন খোলা' নাটকের মাধ্যমে এ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। প্রথম প্রচেষ্টাতেই তারা সাফল্য অর্জন করেন। এরপর মঞ্চস্থ হয়েছে 'কেরামত মঙ্গল'। 'হাত হদাই' মঞ্চায়নের মাধ্যমে ঢাকা থিয়েটার তাদের নিজস্ব তত্ত্ব প্রয়োগের আদর্শ ও অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেছে। এ নাটকের বিশেষ একটি দিক হচ্ছে, গল্পকথন রীতিতে ধারাবাহিকতা খণ্ডন। এ ধরনের নাটক মঞ্চায়ন করা একটি শ্রমসাধ্য কাজ। নাট্য নির্দেশকের গভীর জীবনবোধ ও দক্ষতা না থাকলে কোনোক্রমেই 'হাত হদাই' মঞ্চায়ন সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে নাসির উদ্দিন ইউসুফ একজন সফল ব্যক্তিত্ব। 'হাত হদাই' নাটকটিও এর একটি স্বাক্ষর। এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা নাটকের কোনো নিজস্ব ধারা নেই। ইংরেজি নাটকের অনুসরণে তা লিখিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। ফলে বাংলা নাটকে লোকজ জীবনের প্রবহমান ধারা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকেছে। গ্রামীণ মানুষের লোকজ সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে ঢাকা থিয়েটার।

'হাত হদাই' নাটকের চরিত্রগুলো বিষাদগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও এর পরিণতি মিলনাত্মক। 'হাত হদাই' নাটকের রূপান্তরে যুক্ত হয়েছে নতুন নির্মাণ কাঠামো ও মহাকাব্যিক উপাদান। নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ নাটকের কুশীলব হিসাবে নতুন মুখ উপহার দিয়েও 'হাত হদাই' নাটক সফলভাবে মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকে আনার ভান্ডারী চরিত্রে রাইসুল ইসলাম আসাদ, চুক্কুনীর চরিত্রে শিমুল ইউসুফ, নাড়ুর চরিত্রে সুভাশিষ ভৌমিক ও মোদুর চরিত্রে শহীদুজ্জামান সেলিম চমৎকার অভিনয় করেন। কিন্তু এরপরও অন্যান্য কুশীলবকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কারণ 'হাত হদাই' নাটকের মঞ্চ সাফল্যের পেছনে রয়েছে একটি সুন্দর টিমওয়ার্ক।

চাকা

স্বাধীনতা-উত্তর রক্তক্ষরণের পর বাংলাদেশের মাটিতে ছিল রক্তের দাগ, নাম না জানা শহীদের কঙ্কাল ও ধ্বংসস্তূপ। তারই মধ্য থেকে অঙ্কুরিত হয়েছে গ্রুপ থিয়েটার দলগুলো। সেখানেও ছিল তরুণদের মর্মছেঁড়া উত্তেজনা ও আবেগ। সেই আবেগকে ঢাকা থিয়েটার চেয়েছে সৃজনশীলতায় রূপ দিতে। প্রথম দিকে মনে হয়নি ঢাকা থিয়েটার নিজস্ব নাট্যধারা সৃষ্টির প্রয়াসে নিয়োজিত। তবে লোকপুরাণের মধ্যে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্বেষণে ঢাকা থিয়েটার ছিল নিবেদিত। ঢাকা থিয়েটার লোকপুরাণের সঙ্গে সমকালকে সংশ্লেষণ করেছে বরাবর। ফলে ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত সেলিম আল দীনের নাটকে রয়েছে ঐতিহ্যের গভীরতা। 'চাকা' নাটকও এর ব্যতিক্রম নয়। 'চাকা' নাটকের মূল কাহিনীকে গ্রন্থনা করেছে একটি বেওয়ারিশ লাশ। নাট্যকারের ভাষায় 'সরকারি লাশ'। সরকারি শব্দটির মাধ্যমে নাট্যকার সেলিম আল দীন একটি প্রতীকী ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন, যাতে অভিব্যক্ত হয়েছে একটি লাশের নিঃশব্দ আর্তনাদে। লাশ যত প্রিয়ই হোক না কেন, একে ঘরে রাখা যায় না। তবু একজন শহীদের লাশকে পুষ্প মণ্ডিত করে আমাদের সমাজ গড়ে তুলেছে আত্মত্যাগের শিখরস্তম্ভ। আর তা ফিনিক্স পাখির মতো প্রভাময় চেতনা হয়ে আকাশ ছাড়িয়ে উঠে গিয়েছে আরেক আকাশের দিকে। নাট্যকার সেলিম আল দীন এ লাশের মধ্যে সেই চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। তবু লাশটি দেখে মানুষ ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে। কেউ লাশটিকে গ্রহণ করতে চায়নি। এ লাশ এসেছে কাকেশ্বরী গাঙের পাড়ের একটি হাসপাতাল থেকে। এ লাশটির সৎকারের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে একজন গাড়োয়ানের গাড়িতে তুলে দেয়। এ গাড়োয়ানের নাম বাহের গাড়োয়ান। তিনি ধান কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশের নামের সঙ্গে একটি গ্রামের ঠিকানার মিল খুঁজে পায়। এরপরই তারা লাশটিকে তুলে দেয় গাড়োয়ানের গাড়িতে। এর বেশি দায়িত্ব তারা পালন করেনি। কাস্তে দিয়ে সোনালি ধান কাটার সময় যে ধ্বনি জেগে ওঠে নাট্যকার সেলিম আল দীন সেই মর্মছেড়া আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন লাশের মধ্যে। আর তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে পুরো নাটকে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে যে মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করে, সেই মহাপ্রলয়ের মধ্য থেকে উঠে এসেছে এ লাশ। এ লাশের জন্য বাহের গাড়োয়ানের চোখে গর্জন করে উঠেছে উন্মত্ত সমুদ্র। এদেশের একজন টেকসই শ্রমিক হচ্ছে বাহরে গাড়োয়ান। তার শ্রম ও ঘামে গঠিত হয়েছে সমাজের উৎপাদন কাঠামো। তার কর্মকাঠামোর মধ্যে একটি লাশ বহনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। অথচ তা হবার কথা নয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাহের গাড়োয়ানের মতো শ্রমজীবী মানুষরাই বেওয়ারিশ লাশে পরিণত হয়েছে। নাট্যকার সেলিম আল দীন বলেছেন, "গণঅভ্যুত্থানে নিহত পরিচয়হীন লাশ আমাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। সেই বেদনা নাটকে আছে। রাজনৈতিক অভিপ্রায় নাটকের শরীরে নেই, হয়তো শিরায় আছে। আমি 'চাকা' নাটকে সমকালের বেদনাকে নিজস্ব ও নৈসর্গিক ভাষায় রূপ দিয়েছি।" নীল আকাশ, নদী, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, মৌমাছির ঝাঁক, দিগন্তরেখা, জোসনার কুহক, নিষ্পাপ ষাঁড়ের রক্তপাত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লাশটি বহন করে চলেছে বাহের গাড়োয়ান ও তার সঙ্গীরা। পরিচয়হীন লাশের ঠিকানা উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয় তারা। কারণ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গাড়োয়ানের গাড়িতে লাশ তুলে দিলেও এর সঠিক ঠিকানা দিতে ব্যর্থ হয়। নাট্যকার সেলিম আল দীন তা প্রতীকী ভাষায় ব্যক্ত করলেও এর মধ্য থেকেই উঠে এসেছে নির্মম বাস্তবতা। সময়ের পর সময় বয়ে যায়। তবু লাশের ঠিকানা মেলে না। গাড়োয়ান ও তার সঙ্গীরা ক্লান্তি বোধ করে। একটি ঠিকানার অভাব তাদের বোধের মধ্যে চাবুক হানতে থাকে। বাহের গাড়োয়ান, লাশ ও তার সঙ্গীরা মিলে একটি জটিল চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে, যা আমাদের দেশের জনগণের অভিযাত্রার ঠিকানাহীন মানুষের মর্মবেদনাকে তুলে ধরেছে। নাট্যকারের বর্ণনায় মনে হয়েছে, এদেশের শ্রমজীবী মানুষ বহন করে চলেছে একটি বেওয়ারিশ লাশ। এ লাশের সম্পর্ক রয়েছে এদেশের গ্রাম, নিসর্গ ও নদীর সঙ্গে।

বাহের গাড়োয়ানের গাড়িতে তুলে দেয়া লাশের ঠিকানা কোনো গ্রামের তরুণের নামের সঙ্গে মেলে না। অজ্ঞাতনামা কোনো তরুণের লাশকে কোনো

গ্রামের মানুষ গ্রহণ করে না। বরং লাশ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষ। শুধু একজন বৃদ্ধা এ লাশকে নিজের আপনজন বলে শনাক্ত করার চেষ্টা করে। যেন লাশের সঙ্গে রয়েছে তার শতাব্দীর সম্পর্ক। বৃদ্ধের ক্রন্দন ধ্বনির মধ্য থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে একজন তরুণকে শনাক্ত করার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কে এই বৃদ্ধ? নাট্যকার তা স্পষ্ট করে বলেননি। চরিত্রটি ক্ষুদ্র হলেও এর মধ্য থেকে জেগে ওঠে চিরায়ত মমত্ববোধ। এই বোধের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় একটি লাশের ঠিকানা। এ লাশটি যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আমাদের সমাজ কাঠামোর মধ্যে।

লাশ বহন করতে করতে গাড়োয়ান ও তার সঙ্গীদের কাছে লাশটি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তবু তারা লাশটিকে দাফন করে একটি শীর্ণ নদীর বালুচরে। এরপর ধান কাটতে চলে যায় দিল সোহাগীর চরে। সেখানে ধানের চাষ হয়। সেখানেই দাফন করা হয় লাশ। তবে কি লাশ থেকেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে ক্ষুধামুক্তির স্বর্ণশিখা? এভাবেই একটি প্রশ্নবোধক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নাটকের শেষ দৃশ্যের যবনিকা পতন হয়েছে।

নাটকের প্রধান চরিত্র বাহের গাড়োয়ানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাইসুল ইসলাম আসাদ। তার শিল্প সত্তার অন্তর্গত রক্তক্ষরণে মূর্ত হয়ে উঠেছে চরিত্রটি। তিনি অভিনয়ের ক্ষেত্রে দেশজ অভিনয় রীতির সঙ্গে সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন গ্রোটেভসকির ফিজিক্যাল থিয়েটারের অভিনয় রীতি। সিসা যেমন সালফিউরিক এসিডে দ্রবীভূত হয়, আসাদ তেমনি মিশে গিয়েছেন চরিত্রটির সঙ্গে। এদিক থেকে তিনি ক্লাসিক রীতিরই অনুসারী। কিন্তু শবানুগামী বাহের গাড়োয়ানের পথ চলার মধ্যে আসাদকে মনে হয়েছে অন্তর্মুখী অভিনেতা। তার মুদ্রাগুলোর মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লাশবাহী গাড়োয়ানের মর্মবেদনা।

শিমুল ইউসুফ এ নাটকে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সূত্রধর, গরুর গাড়ির মিস্ত্রী, চাচি, গাড়িওয়ালা ও লাশ। লাশের চরিত্রে তিনি মাত্র কয়েকটি মুদ্রা তুলে ধরেছেন। কিন্তু মূল নাটকের লাশ হচ্ছে একটি প্রতীকী অভিব্যক্তি। নির্দেশক জামিল আহমেদ সাদা কাফনে জড়ানো বাঁকা কাঠের টুকরোকে ব্যবহার করেছেন লাশ হিসাবে। কিন্তু কখনো মনে হয়নি কাঠের টুকরোটি কোনো অভিনেতা নয়। বরং পুরো নাটকের মাধ্যমে কাঠের টুকরোটি মূর্ত হয়ে উঠেছে এচিং-এর মতো। এ ক্ষেত্রে নির্দেশক জামিল আহমেদ প্রাচ্যদেশীয় অভিনয় রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। 'চাকা' নাটকে কখনো কখনো তিনি কনস্ট্রাক্টিভিজম পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। অভিনয়ের এ রীতিমালাকে চরিত্রগুলোর উপযোগী করে তোলার

জন্য মঞ্চ পরিকল্পনায় এনেছেন নতুনত্ব। তিনি তার মঞ্চ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করেছেন হলের সমতল পটভূমি। এ পটভূমির উপরে গড়ে তুলেছেন উন্মুক্ত প্রান্তর, খেয়াঘাট, বালুচর, মেঠোপথ, উঁচু জমি ইত্যাদি এবং আলোক পরিকল্পনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন ভোরবেলার কুয়াশা, নরম আলোর প্রভা, সন্ধ্যা ও রাতের দৃশ্য। যেখানে গিয়ে আলো পড়েছে, সে স্থানকেই মনে হয়েছে ভাস্কর্যের মহিমায় ফুটে ওঠা চিত্রকলা। মঞ্চের কাঠামো নির্মাণের কারণেই তা মনে হয়েছে। এসব দিক বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত 'চাকা' নাটকটি গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের একটি স্তম্ভ। জামিল আহমেদের নির্দেশনার গুণেই সম্ভব হয়েছে 'চাকা' নাটকের মতো একটি মহাকাব্যধর্মী জটিল উপস্থাপনা। নাটকের চরিত্রগুলোর সঙ্গে গ্রন্থিকগণ অবলীন হয়ে গিয়েছেন।

'কাজের ভাষা গদ্য'

কৃত্য, কথকতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে বাংলা নাটককে সেলিম আল দীন একটি নিজস্ব ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজে বের করেছেন বাংলা এপিক। বাংলার অকুতোভয় জনপদের মানুষের মৃত্যু ও জীবনের মহিমা অঙ্কনে তার কলম অর্জন করেছে অমেয় দীপ্তি। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, "আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, বাংলা নাটকে আমরাই (অর্থাৎ ঢাকা থিয়েটার) দেশজ আঙ্গিকের নাটকের কথা উচ্চারণ করেছি। এ কথা বলার জন্য আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে গালমন্দের ইষ্টক। এখন আমি এই ভেবে আনন্দিত, আমরা বাংলা নাটককে আঙ্গিকের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছি। তা দর্শকরা আন্তরিকতার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। আমরা নাটককে মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দর্শকদের চোখে স্বপ্নের মহিমা খুলে দিয়েছি, যেখানে আছে দিগন্ত বিস্তৃত নীলাভ আকাশ, খরস্রোতা নদী, সাম্পানের চেরা গলুই, তামাকের কড়া ঘ্রাণ।' এ প্রসঙ্গে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছে। তাকে প্রশ্ন করা হয়–

আপনি নাটক রচনার ক্ষেত্রে এক ধরনের বর্ণনাত্মক রীতি ব্যবহার করেছেন। তা অনেকটা প্রাচীন গ্রিসের এপিকের মতো। বাংলা ভাষার দিক থেকে তা মঙ্গল কাব্যের অনুসারী। এতে ভারত পুরাণের শেকড় সন্ধানও রয়েছে। এ মিশ্র রীতির ব্যবহার করার মূলে আপনার কোন অনুপ্রেরণা কাজ করেছে?

সেলিম আল দীন : 'চাকা' নাটকের মাধ্যমে এ রীতিটি পাকাপোক্ত হয়েছে আমার মনে। 'যৈবতী কন্যার মন'-এর মাধ্যমে এর পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। আমি কথার সাহায্যে নাটক রচনা করেছি। তাই এর নাম দিয়েছি কথানাট্য। গৃহাঙ্গনে কথক যে কিস্‌সা বলেন, সে রীতির সঙ্গে চাকার আঙ্গিক রীতির সম্পর্ক রয়েছে। আমি সব সময় চেয়েছি আমার লেখা নাটকগুলো নাটকের বন্ধন ভেঙে অন্য এক শিল্পতীর্থে উন্নীত হোক। আমার 'চাকা' নাটককে কেউ বলেছে উপন্যাস, কেউ বলেছে কাব্য, আবার কেউ বলেছে নাটক। মূলত সব ধরনের উপাদান রয়েছে 'চাকা' নাটকে। এতে রয়েছে সংগীতের স্পর্শ। কথানাট্যকে আমি পুরাণ এবং লোককথা মুক্ত করতে চেয়েছি। তাই 'চাকা' নাটকে ঘটনার উৎসর্গ পড়লে ধারনাটি আরো স্পষ্ট হবে। আমি নাটকটি শিমুল ইউসুফকে উৎসর্গ করেছি। এ নাটকের মধ্যে যে গীতি সুর আছে, প্রথম রাতে নাটক পাঠকালেই সে সুর তার কানে বেজেছে। ঐতিহ্যবাহী নাট্যাভিনয়ের ধমনীতে সংগীতের যে তরঙ্গ-আমাদের কালে শিমুল এবং তার মতো দুই একজন তা বহন করে চলেছে। 'চাকা' রূপক সাংকেতিক নাটক নয়- সরল বাস্তবতা অনুসরণও তার লক্ষ্য ছিল না। আমার অন্য সব নাটকের মতো এ নাটকে পুরাণ আছে। কিন্তু এটি একটি অলঙ্কার মাত্র। চাকার গল্পটা গল্পই। নাটকটি যদি কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার বিবরণ মনে করা হয়, তাতেও আপত্তি করব না। কথকতার জন্য নাটকটি রচনার জন্য বর্ণনাত্মক রীতির প্রয়োজন ছিল। কথকতা অভিনয় রীতির নাম, নাট্যরীতির নাম নয়। রামায়ণও কথকতা। কিন্তু আসরে গোকগল্প বলার রীতিটাকে আমরা কথকতা বলি না। কারণ, যারা পুরাণ কিংবা লোককথাগুলো পরিবেশন করেন তারা একে শাস্ত্র গান কিংবা হাস্তর বলেন। ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে কিস্‌সা কথনকে বলা হয় শাস্ত্র গান কিংবা হাস্তর।

ফোক মোটিভ থেকে আপনার নাটকে বেশ কিছু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। সেই সঙ্গে আপনি বেশ কিছু নাট্য পরিভাষার ব্যবহার করেছেন। কথানাট্য তার মধ্যে একটি। 'চাকা' নাটকের মাধ্যমে এর স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। এরপর আপনার লক্ষ্য কি?

সেলিম আল দীন : প্রাকবুদ্ধকাল, চর্যাপদ ও উত্তরকাল থেকে উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলা গান, নাট্যপালা, উপাখ্যান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য- এমনকি এদেশে প্রচলিত নানা ধর্মদর্শনের মধ্যে একটি পারস্পরিক সাধারণকৃত নন্দনতাত্ত্বিক ঐক্য অনুধাবন করা যায়। এ কথা থেকে আমার মনে হয়েছে, এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানা শিল্প মাধ্যমে সমাজ, সম্প্রদায় কিংবা নৃ-

গোষ্ঠীর মধ্যে শিল্পরুচি ও সৌন্দর্য বিচারের একটি সাধারণ সূত্র ছিল। এ সময়ে কেউ বাঙালির নন্দননতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনা কিংবা সূত্রবদ্ধ করেনি। নানা মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব বা দর্শন, মুক্তচিন্তা ও অলঙ্করণ রীতি ছিল বাঙালির চিত্ত বিকাশের নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু সহস্র বছর ধরে গড়ে ওঠা আমাদের শিল্প সৌন্দর্য বিচাররীতির ক্ষেত্রে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের প্রভাব সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। বিশ শতকে তা হয়ে ওঠে প্রায় অপ্রতিরোধ্য। সহস্র বছর ধরে রচিত যে সব শিল্পকর্ম বাঙালির চিত্ত জয় করেছে, তা এ্যারিস্টটল কিংবা হোরেসের বিচারে খুব সামান্য বলেই মনে হয়। আমাদের পালা নাটকগুলো নাটকই নয়। লীলা নাটক না কমেডি না ট্র্যাজেডি। গাজীর গান তো নাটক নয়, কাব্য। তা সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের শিল্পরুচির বিবর্তনে জাতীয় মানস ও অনুধ্যানের ধারাবাহিকায় গড়ে উঠেছিল। ইরানি রীতির শাস্ত্রকথনের সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রকথনের একটি চমৎকার মিল রয়েছে। পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মিনিয়েচার পেইন্টিং-এ সে কালের কথানাট্য রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। Dr. R. Gelpke কর্তৃক নিজামীর হপ্তপয়করের ইংরেজি ভাষান্তর 'দ্য স্টোরি অব সেভেন প্রিন্সেস' গ্রন্থে সন্নিবেশিত মিনিয়েচারের কথা আমাদের হাস্তর কথনের রীতির সঙ্গে মিলে যায়। এ ধরনের তুলনামূলক নাট্য আঙ্গিকের সন্ধান করছি আমি। ঢাকা থিয়েটারই বাংলা নাটকে প্রথম জাতীয় আঙ্গিক ও বর্ণনাত্মক রীতির ব্যবহার করেছে। আমরাই প্রথম সচেতনভাবে ইউরোপীয় উনিশ শতকের অন্ধ আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করি। জাতীয় নাট্য আঙ্গিক বলতে আমরা কোনো নির্দিষ্ট আঙ্গিকের কথা বলি না। বরং প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্ম ও লোকাচারসহ নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সকল উপাখ্যান ও কৃত্যের জন্ম হয়েছিল, সে সকল বিষয়ই হচ্ছে জাতীয় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য। 'কিত্তনখোলা' নাটক রচনার সময় মনে হয়েছিল ইউরোপীয় নাট্যরীতির একমুখী কাহিনীর সঙ্গে বাংলা নাটকের বিরোধ রয়েছে। মঙ্গল কাব্যে রয়েছে কাহিনী ও অনেক অণুকাহিনী। বিশাল বিস্তারে রচিত হয় এ বিশাল কাব্য। 'কিত্তনখোলা' এবং পরবর্তী দুটি নাটক 'কেরামত মঙ্গল' ও 'হাত হদাই' রচনার সময় মঙ্গল কাব্যের গঠনরীতি অনুসরণ করেছি।

নাটক তিনটিতে ইউরোপীয় অভিনয় রীতিও পরিহার করেছেন।

সেলিম আল দীন : অভিনয়ে ইউরোপীয় অনুকরণ তত্ত্বের বদলে আমরা অভিনয়কে জীবনে ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। বর্ণনা এবং সংলাপ ক্রমেই আমাদের নাটকে অদ্বৈত হয়ে ওঠে। এ সময় ঢাকা থিয়েটার অন্তত তিনটি

নাট্য পরিভাষা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জাতীয় নাট্য আঙ্গিক, বর্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিক ও বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতি।

আপনি আপনার কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল এবং হাত হদাই নাটককে এপিক রিয়ালিজমের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এপিক রিয়ালিজমকে আপনি কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন?

সেলিম আল দীন : কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল ও হাতহদাই-এ ত্রয়ী নাটকের অনুপ্রেরণার স্থল চিরায়ত এপিক ও ধর্ম। বিশেষত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন চেতনা। এমনকি আঙ্গিক পর্যন্ত এপিক বা মহাকাব্যের শীর্ষ বিন্দুতে মিশে গেছে। আমার মনে পড়ছে, বৌদ্ধ জাতকের গল্প, ওভিদের মেটামরফেমিস পাপ ও কর্মফলের শ্লাঘা, শিল্প লেখা, ডিভাইন কমেডি ও মহাভারতের নরক বর্ণনা। আমার কাছে মনে হয়েছে, ওডিসি, ইনিড কিংবা সিন্দাবাদের সমুদ্র ভ্রমণ দ্বৈতাদ্বৈতের টঙ্কার তোলে। বাস্তবতা আমার লক্ষ্য নয়। বর্তমানও অবলম্বন মাত্র। এ ত্রয়ী নাটকের মাধ্যমে প্রাচ্য মানবের আকার অঙ্কনে প্রয়াসী ছিলাম। এ নিয়মটাকেই আমি মহাকাব্যিক বা এপিক রিয়ালিজম হিসাবে শনাক্ত করেছি।

এ তিনটি নাটকের আঙ্গিক সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?

সেলিম আল দীন : একজন লেখক যখন তার রচনার বিষয়কালীন ভাষা নিয়ে কাজ করেন, তখন তিনি আঙ্গিক ভেদটিকে মনে রাখেন না। তার রচনার প্রয়োজনীয় অন্য সব মাধ্যম ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মস্থ করে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' এবং তিনি বৃক্ষরাজিকে মাটির বন্ধন ছিঁড়ে হংস বলাকার শব্দলেখা ধরে দিশেহারা হতে দেখেছিলেন। কিন্তু কেন? আঙ্গিকের বন্ধন চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করলে পর্বত কিংবা বৃক্ষরাজির তো তৃপ্ত থাকার কথা। 'চাকা' নাটকে আঙ্গিকের মুক্তি ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস। 'চাকা' পুরোটাই গ্রামীণ, কাব্য, পুরোটাই একটি নাটক এবং একই সঙ্গে গল্পও বটে। 'যৈবতী কন্যার মন' এবং 'হরগজ' সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। আমি শিল্পে আঙ্গিক লোপের প্রেরণায় কাজ করি এবং শিল্পের নানা মাধ্যম পৃথকীকরণে বিশ্বাসী। শিল্পে আমি দ্বৈতের মধ্য দিয়ে অদ্বৈতে উপনীত হতে চাই। আমি বিশ্বাস করি আঙ্গিকের মধ্যেই আঙ্গিক বিনাশী শক্তি আছে। তাকে চিনতে গেলেই দেখা যায়, সর্বত্র সে অবিনীত দৃঢ় মূর্তি। শিল্পের নিয়ম তার জন্য। অথচ সে শিল্প সংহারী। 'কিত্তনখোলা' নাটক রচনার সময় আমার আবিষ্টতা এমন এক বিন্দুতে মিলিত

হয়েছিল, যাতে নানা শিল্প মাধ্যম সম্পর্কে আমার নৈয়ায়িক ভেদবোধ লুপ্ত হবার উপক্রম হয়। ১৯৮১-৮২ সালে আমার মনে হয়েছিল কোথাও লেখাটা প্রচলিত অর্থে নাটক থাকছে না। তখন আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল আঙ্গিক ভাঙার কাজটি চূড়ান্ত করা। শিল্পীর কাজ আঙ্গিকের মাধ্যমে আঙ্গিক ভেঙে তার নিজস্ব সৃষ্টিকে শিল্প তীর্থে পৌঁছে দেয়া।

আপনি শিল্পদর্শনের দিক দিয়ে নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলে মনে করেন। অথচ আপনার রচনায় রয়েছে দ্বৈতবাদীর জীবনাকর্ষণ। এটা কি আপনার স্ববিরোধিতা?

সেলিম আল দীন : একদিকে কাহিনী আছে। আবার এরই আশ্রয় হচ্ছে সংগীত। গোটাটাই হচ্ছে একটি কাব্য। আবার গোটাটাই সংগীত। মঙ্গল কাব্যের কথাই বলি, ধর্ম এবং কাহিনী যেখানে একীভূত, কৃত্য ও কাহিনী সেখানেই একীভূত। আমি যে বিশেষ শিল্পদর্শনকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প হিসাবে মনে করছি, তার কম-বেশি লক্ষণ 'কিত্তন খোলা', 'কেরামত মঙ্গল' ও 'হাত হদাই'তে রয়েছে। অবশ্য বড় শিল্পী নিজের ক্ষমতায় অযৌক্তিক দ্বৈতবাদিতাকে সৃষ্টির প্রাবল্যে অতিক্রম করেছেন। শেষ কথাটি হলো, বাঙালির নিজস্ব শিল্পদর্শনের ইতিহাস পাওয়া যায়নি। ইতিহাস আছে এমন প্রমাণ নেই। এ অভাব বোধ থেকেই মনে হয়েছে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ধারনাটি পরিবর্তিত আকারে বাংলা শিল্পতত্ত্ব রচনায় কাজে লাগানো যেতে পারে।

আপনি নাটকের মধ্যে গান লেখেন। কোনো কোনো গান নিজে সুরারোপ করেছেন। এটা কি আপনার নিছক খেয়াল, না কি সচেতন শিল্প প্রয়াস?

সেলিম আল দীন : প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৮ সাল থেকে সংগীত বিষয়ে আমার আগ্রহ নিয়মিত চর্চায় রূপান্তরিত হয়। সংগীত বিষয়ে আমার প্রেরণার উৎস 'মুনতাসির ফ্যান্টাসী' নাটকে শিমুল ইউসুফের সুরারোপ। যৌবনের শুরুতে আমার মনে হয়েছিল, বাংলা নাটকের চর্চায় গানের জ্ঞান একজন নাট্যকারের জন্য অপরিহার্য। এ সময় দীলিপ রায় এবং উমা বসুর গানের কারুকাজে আমি অষ্টপ্রহর মগ্ন থাকতাম। দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র-অতুল-নজরুলের গানের সঙ্গে দীলিপ রায়কে মিলিয়ে আমার অভিজ্ঞতার সীমা খানিকটা বিস্তৃত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কে এ সময় আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। ধ্রুপদী ও লোক সংগীতের মিশ্রণে 'মহুয়া' ও 'দেওয়ানা মদিনা' সুরারোপ করেছি। রবীন্দ্রনাথের 'জয় পরাজয়' গল্পটি প্রায় সম্পূর্ণ সুরারোপ করেছি। গদ্য ভেঙে

গান করার চেষ্টা করেছি সেখানে। 'চাকা'র সবকটা গানই সরাসরি গদ্যে সুরারোপ। নাটক ছাড়া নির্ভেজাল গানে সুর করার বাসনা আমার নেই।

কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল ও হাতহদাই নাটক ত্রয়ী রচনার পর আপনি নাটকের জন্য আর একটি ভিন্ন রীতি প্রবর্তন করেছেন। এর মধ্যে চাকা, যৈবতী কন্যার মন ও হরগজ নাটক তিনটিতে উপন্যাসের বর্ণনার বিস্তৃতি রয়েছে। এগুলোকে কথানাট্য বলছেন কেন?

সেলিম আল দীন : 'হাত হদাই' রচনাকালেই পাশ্চাত্য নাটকের সংলাপ ভিত্তিক গড়নটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। চেতনা-অবচেতনার অনেক কিছুই সংলাপে ধরা পড়ে না। একটি জায়গায় সংলাপকে অসম্পূর্ণ মনে হয়। সে স্থানটি বর্ণনা দিয়ে ভরাট করা উচিত। ঐতিহ্যবাহী বাংলা কথকতা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। নাটক তিনটি রচনার সময় এ রীতির দিকে আমার চোখ ফেরানো ছিল। তাছাড়া সংস্কৃত কথা সরিৎসাগর এ রীতি সৃজন আমাকের সমভাবে সাহায্য করেছে। বিষাদ ও চুটকি জারিতে গায়েন এক পাশে দাঁড়িয়ে ছড়া বা গান বলে যান এবং নৃত্যপর দোহারগণ সে অনুসারে নানা ভাব ফুটিয়ে তোলেন। জারি আদ্যোপান্ত এক আশ্চর্য দেহ ছন্দের মিশ্রণে সৃষ্ট বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি। 'যৈবতী কন্যার মন' রচনাকালে গল্পকথন পদ্ধতি আমাকে প্রভাবিত করেছে। 'যৈবতী কন্যার মন' কথানাট্যের মাধ্যমে মৃত নারীর ফিরে আসা জীবন কাহিনী বলার মাধ্যমে সময়গত কৌশল প্রয়োগ করেছি। এ গল্প কথনের একদিকে যেমন সময়ের ঐক্য ব্যবহার করেছি, অন্যদিকে তেমনি সময়কে ভাঙচুর করেছি। এর ফলে কথানাট্যে মহাজাগতিক আবর্তনে দর্শকদের মনে হয়ত একটি মহাজাগতিক বোধ সঞ্চারিত হবে। বা হয়েছে। 'যৈবতী কন্যার মন' কথানাট্যের প্রথম খণ্ডে অষ্টাদশ শতকের গীতিকা পালার দ্বন্দ্বের ছবি আঁকতে চেয়েছি। এ শতকে মঙ্গলকাব্যের ধারা ক্ষীণ হয়ে এলেও তা লোক আচার ও বিশ্বাসের নানান স্তরে বেঁচে ছিল। গীতিকার মতো পূর্ণাঙ্গ মানব রস সিক্ত প্রবল ধারার সময়ে এ দেশে পীর পূজাদির প্রচলন হয়েছিল। যৈবতী কন্যার কালিন্দী ধর্ম বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছিল প্রেম ও প্রণয়ের টানে। অথচ অবিচল বিশ্বাস নিয়ে সে দাঁড়াতে পারলো না। একই নারীর ভিন্ন রূপান্তর, প্রাকৃত জীবনের গন্ধমাখা এক নারী হচ্ছে পরী। শিল্পের মধ্যে সে যে অহং নির্মাণ করলো, তা আত্মবিনাশী।

কিন্তু দুই নারী এক নারীকল্প কেন?

সেলিম আল দীন : এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। হয়ত এক নারীর মধ্যে ভিন্ন দুই কালের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবেই নারী চিত্তের বিচিত্র

ঐশ্বর্যের সৌন্দর্য আস্বাদ করতে চেয়েছি। 'যৈবতী কন্যার মন' কথানাট্যে তৃতীয় পুরুষ ও উত্তম পুরুষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমাকে সচেতন থাকতে হয়েছে, যাতে উত্তম পুরুষে বা তৃতীয় পুরুষে রচিত বচন দর্শক শ্রোতার কানকে ক্লিষ্ট না করে। অবশ্য এ মিশ্রণ কোনো আনুপাতিক হারে করা হয়নি।

বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির প্রকৌশলগত দিক সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি। বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

সেলিম আল দীন : অনুকরণাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্রের বস্তুগত ক্রিয়াকে দর্শকদের সামনে সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এ জন্য এ রীতিতে আহার্যবচন চরিত্র সর্বস্ব বাস্তব জগতের প্রতিভঙ্গিকরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে বর্ণনাত্মক অভিনয় হচ্ছে বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনীর উপস্থাপনা করা হয়। এর দার্শনিক অভিপ্রায় হচ্ছে ব্যাখ্যা প্রদান; প্রতিভঙ্গি সৃষ্টি করা নয়। এর বাহ্যিক অবলম্বন হচ্ছে বর্ণনা, অভিনয় নয়। বর্ণনার অর্থ বিবরণ। এ বিবরণ অভিনয়ের সঙ্গে মিশে থাকে। বর্ণনাত্মক অভিনয়ে নানা ভেদ রয়েছে। গায়েন বর্ণনাত্মক রীতির আশ্রয় নেন এবং গায়েন কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। আবার দোহার সহযোগে এ দুই ধারারই সংমিশ্রণ ঘটান। শুদ্ধ বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির নমুনা গাজীর গান, হাস্তর গান প্রভৃতি শ্রেণীর কৃত্যনাট্য ও লোকনাট্যে রয়েছে।

আপনি নাটকের ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। গদ্য ও কবিতার সংমিশ্রণ রয়েছ আপনার নাটকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গদ্য হয়ে উঠেছে সুরের বাহন। আবার তৎসম শব্দের সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। একে কি আপনি ক্রুটি বলবেন?

সেলিম আল দীন : শিল্পীর কাছে গদ্য বলে কিছু নেই। লেখকের লেখা গদ্য হতে পারে না। কাজের ভাষা গদ্য শিল্পীর ভাষা কবিতা। তাই আমার নাটকে গদ্য পদ্যের ভেদাভেদ অবলুপ্ত। উপন্যাসকে আমি উপন্যাস মনে করি না। নাটককে আমি নাটক মনে করি না। আবার দুটোই মনে করি। আমার 'চাকা' পড়ে অনেক পাঠক বলেছেন, এটি উপন্যাস। আমি না বলিনি। আবার কেউ বলেছেন এপিক। আমি তা অস্বীকার করিনি। 'হরগজ' স্পর্কেও একই কথা বলা হয়েছে। পাঠকের ইচ্ছার উপর এর ব্যাখ্যার ভার ছেড়ে দিয়েছি। গদ্য, পদ্য ও উপন্যাসের সব কিছুই আমার নাটকে রয়েছে। দর্শকের কাছে যা নাটক, পাঠকের কাছে তা এপিক কিংবা উপন্যাস।

আপনার নাটক সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য নয়। তাই দর্শকদের দিকে চেয়ে আপনি নাটক লেখেন। সেখানে নির্দেশকের কড়াকড়ি থাকা স্বাভাবিক। আপনার 'কেরামত মঙ্গল' নাটকটি ছিল চার ঘন্টার। তা কাটছাঁট করে তিন ঘন্টায় আনা হয়েছে। এতে কি আপনার নাটকের মান ক্ষুণ্ন হয়েছে?

সেলিম আল দীন : আমি আগেও বলেছি, নাসির উদ্দিন ইউসুফের নাট্য প্রজ্ঞা বাংলা মঞ্চে একটি বিরল স্পর্শ। আমার 'কেরামত মঙ্গল'সহ অন্যান্য নাটকের পরিমার্জনায় তার হাত রয়েছে। আমার বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে তিনিই প্রথম বর্ণানাত্মক অভিনয়ের সূচনা করেন। কেরামত মঙ্গলের একটি দৃশ্য তিনি বাদ দিয়েছেন শহুরে দর্শকদের কথা ভেবে। আমার মতে থিয়েটার দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনাশ্রয়ী মাধ্যম। থিয়েটার কোনকালেই এককভাবে নাট্যকারের অধীন ছিল না। তেমনিভাবে তা কেবল নির্দেশকের দর্শন নির্ভরও ছিল না। অন্যদিকে থিয়েটার কেবল অভিনেতার রুচি ও প্রাধান্যকে মেনে নেবে- এমন ভাবাও দুষ্কর। তবে এক কালে যখন নাট্যকার ছিল না, তখনও অভিনেতা এবং নির্দেশক ছিল। কালক্রমে থিয়েটার যখন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তখন প্রয়োজন পড়ল নাট্যকারের। কেননা নাটক শুধু দৈহিক ক্রিয়া নির্ভর নয়; ভাষা নির্ভরও বটে। ভাঙন বা গড়ন তাতে নাট্যকারের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি আছে? স্তানিস্লাভস্কি চেরী অর্চাডের বড় একটি অংশ বাদ দিয়েছেন- এতে হলোটা কি? নাট্যকাররা লিখতে পারেন ফাউস্ট। তা শতবর্ষেও মঞ্চে আনা সম্ভব না হতে পারে। পিটার ব্রুক যত বড় নির্দেশকই হোন না কেন, তার কৃতিত্ব তো শেক্সপীয়রের সমুদ্র মন্থনে। নাট্যকার ও নির্দেশক হচ্ছেন একটি সম্মিলিত শক্তি অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত। নাটক যদি মঞ্চস্থ হয়, তবে তা স্বীকার করতেই হবে।

আমরা যতদূর জানি, এ দেশে পথনাটকের উদগাতা ঢাকা থিয়েটার। আপনি কী বলেন?

সেলিম আল দীন : ১৯৭৭ সালে ঢাকা থিয়েটার এ দেশে নাটককে প্রথম রাস্তায় নিয়ে আসে। সে পথ ধরেই পথনাটক মঞ্চায়ন শুরু হয়েছে। পথনাটকে এ ধরনের গণজাগরণের স্পর্শ রয়েছে। অবশ্য আমাদের প্রথম নাটক চর কাঁকড়ার ডমুমেন্টারি'র বিষয় ছিল ভিন্ন। কোনো এক সমুদ্র দ্বীপে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় দ্বীপবাসীরা এক বিশাল সামুদ্রিক প্রাণীকে হত্যা করে। পরিনাম সে দ্বীপে নেমে আসে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

আপনার নাটকে রয়েছে সমাজ সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান। আপনি কি মনে করেন রাজনৈতিক চেতনা হচ্ছে সামাজিক চেতনার অগ্রসর স্তর?

সেলিম আল দীন : আমাদের দেশে ব্যাপক সামাজিক চেতনা থেকে রাজনীতির জন্ম হয়নি। এর জন্ম হয়েছে সামন্ত প্রভুর আলখাল্লা থেকে। শিল্পী তার লেখার মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হন। তিনি সামাজিক চেতনার ক্রম পর্যায়ে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনায় ঋদ্ধ হন। সে দিক থেকে রাজনীতি হচ্ছে সামাজিক চেতনার অগ্রসর স্তর।

'হরগজ' নাটক সম্পর্কে আপনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। এর বিষয়বস্তুতে রয়েছে মানবজীবনের ট্র্যাজিক অনুভূতি। অথচ কোনো বীরের চরিত্র সৃষ্টি করেননি নাটকে। মৃত্যুচিন্তা, বিশ্ব ভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের ত্রাণ তৎপরতার স্বাক্ষর রয়েছে নাটকে। কিন্তু মানুষের মুক্তি নেই কেন? তবে কি আপনি মানুষের সর্বশেষ গন্তব্য মৃত্যুকেই আরাধ্য মনে করেছেন?

সেলিম আল দীন : আমার সকল লেখার মধ্যে বিশ্বভাবনার কেন্দ্রবিন্দু লেখা হচ্ছে 'হরগজ'। এ রচনায় মৃত্যুকে আমি ধ্বংস ও বিশ্ববিনাশের সমান্তরাল করে দেখতে চেয়েছি। আমরা যে জগৎটাতে বেঁচে আছি, তা নিতান্তই আকৃতির ভুবন। আলো-অন্ধকার, বৃক্ষবল্লী, জীবনের চারপাশে স্তূপীকৃত সহস্র অনুষঙ্গ, সবই তো আকারময়। এ জগতের পাশেই মৃত্যুর ভুবন, বলদর্পী-স্বয়ংক্রিয় ও নৈসর্গিক। সে ভুবনে আকৃতিমাত্রই নিরাকৃত অর্থাৎ খণ্ডিত। জীবনের যে ফিগারেটিভ আয়োজনকে ঘিরে বোধ ও বিশ্বাসের ভূমি রচিত হল, তা সে ভুবনে গেলে বিপর্যস্ত হবেই। কিন্তু তাকে গ্রহণ তো করতে হবে-চাই বা না চাই। তবে তার জন্য প্রস্তুতি আছে কি? হরগজের মূল চরিত্র আবিদ, বলে: 'আজ কোনো অমল পংক্তি নাই, যে আমাকে মানুষের এ ক্লেশ-রক্ত-মাংস থেকে উদ্ধার করে। সে ভেতরে ভেতরে কেঁদে কেঁদে বলে : 'হিসাব মেলে না ঈশ্বর'। এ কথা ট্রাজেডির নায়কের মতোই শোনা যায়। কিন্তু আবিদের উপলব্ধি তাকে নিয়ে যায় শাশ্বতের কাছে: 'এই দেহ অমৃতভাণ্ড সপ্তসিন্ধু শোভিত। এ ব্রহ্মাণ্ডের কতই না রহস্য এ দেহে।'

তবে হরগজ রচনায় কেবল মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা নয়, সমকালীন রাষ্ট্রভাবনারও খানিক ছায়াপাত ঘটে থাকতে পারে। এ নাটক যখন লিখতে শুরু করি, তখন সোভিয়েট রাশিয়ায় ভাঙন লেগেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশও রাষ্ট্র সংজ্ঞার বাইরে চলে যাচ্ছিল। তখন আমার ধারণা হলো যে, বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিপর্যয় চিন্তাটা সক্রিয় ছিল।

আপনি নাটককে আঙ্গিকের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। আপনার আরাধ্য হচ্ছে পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ কিংবা এমন ধরনের অন্য কিছু। বিষয়বস্তুকে কি তা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন?

সেলিম আল দীন : শিল্পের আঙ্গিক ভেদটাকে আমি গৌণরূপেই বিবেচনা করি। কারণ নানা আঙ্গিকের অন্তর্গত সাধনা একটাই, তা হচ্ছে উপলব্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যাওয়া। তখন আর গানের সঙ্গে ভাস্কর্যের কোনো পাথর্ক্য থাকে না। নাটক মিলায় মহাকাব্যের অনুভবে, কবিতা মিলায় নাটকে। পাশ্চাত্যে লঙ্গিনাস যাকে বলেছেন সাবলাইম-সকল শিল্পের পরিচয়টা সেখানে পৌঁছে তবে পূর্ণ হয়। আধুনিককালে সাঁৎবভ, শিল্প শিখরের এমন এক চিত্র এঁকেছেন যাতে দেখা যায়, গ্যেটে-মলিয়ের একই স্বর্গের বাসিন্দা।

এ তো গেল শিল্পের আন্তর্গত রূপের অদ্বৈত পরিচয়ের কথা। এরপর আঙ্গিকের কথা যদি বলি দেখা যায় আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে সকল রচনাকে আমরা কাব্য বলে জানি, সে কেবল তার অনেক রূপের একটি মাত্র পরিচয়কে প্রকাশ করে।

আলাউলের পদ্মাবতী কাব্য বটে, কিন্তু তা গেয় এবং গেয় বলেই অভিনেয়। আবার এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে দর্শক-শ্রোতার সংযোগ ছিল। মূলে এ ধরনের পাঁচালি ছিল গায়েনের নৃত্য বিভঙ্গে মুখর। কাজেই আজকের আঙ্গিক ভেদটাকে ইতিহাসের ধারায় কেউ অস্বীকার করতে চাইলে অবশ্যই দৃষ্টান্ত সহকারে সে তা পারে।

এছাড়া বাঙালির নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনারও সুনির্দিষ্ট রূপটি আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। মধ্যযুগের বাংলা শিল্পরীতি ধর্মতন্ত্রের ধারায় বিচার্য। তাতে দেখা যায় চৈতন্যদেবের অচিন্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পরমপুরুষ লীন হবার যে প্রাকৃতিক সাধনা তার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বাঙালির শিল্প সাধনার এক সূক্ষ্ম মিল আছে। আমি তাই এমন একটি আঙ্গিকের সাধনায় বিশ্বাস করি, যাতে এসে ভিড় করবে সকল শিল্প নিখিল।

যেকোনো বিষয়ই রচয়িতার ক্ষমতায় শিল্প মাধ্যমের ভেদ সত্ত্বেও , তার বিষয়রূপে গৃহীত হতে পারে। তবে তা কোন মাত্রায় পরিশ্রুত হবে তা নির্ভর করে লেখকের কৌশলের উপর। আয়ুর্বেদে 'শোধন' বলে একটি প্রক্রিয়া আছে। তাতে পারদের মতো বিষাক্ত রাসায়নিকও রসুনের রস দ্বারা শোধিত হয়। স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজের ব্যবহৃত স্বর্ণ প্রায় শতবার শোধন করে সেবনোপযোগী করা হয়।

আমি শিল্পে বাস্তবতাকে খানিকটা এ পন্থায়, এর নিজস্ব ভার থেকে মুক্ত করার পক্ষপাতী।

সাধারণ কোনো নির্দেশকের পক্ষে আপনার নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব নয়। নাটকের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক সম্পর্কে যার প্রযুক্তিগত উচ্চ ধারণা রয়েছে, তার পক্ষেই আপনার নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব। অর্থাৎ আপনি শুধু একজন নির্দেশক অর্থাৎ নাসির উদ্দিন ইউসুফের মেধার কথা বিবেচনা করে নাটক লেখেন। এতে কি আপনি সীমবাদ্ধ হয়ে পড়ছেন না?

সেলিম আল দীন : আমাদের দল ঢাকা থিয়েটার বাংলা নাটকের এক সামগ্রিক বিভ্রান্তির কালে আবির্ভূত হয়েছিল। ঢাকা থিয়েটারের হাতেই, গত দু'শ বছরের ইতিহাসে, অর্থাৎ আধুনিককালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত, যে নন্দনতাত্ত্বিক সংকট বিদ্যমান, তা অনেকখানি দূরীভূত হয়েছে। ইউসুফের হাতে বাংলা মঞ্চের নতুন কালের সূচনা এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মঞ্চে দৃশ্যের সঙ্গে অভিনয়, অভিনয়ের সঙ্গে সৌকর্যের এক অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম তিনি। ইউসুফ মঞ্চের পুরো দৃশ্যমান প্রক্রিয়াকে এক চূড়ান্তে নিয়ে যান, যাতে ঐ শিল্প মাধ্যমের বিশেষ আঙ্গিক শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। তার নাটকেই প্রকৃত অর্থে দর্শকদের মধ্যে এক একজন শ্রোতাও জন্ম নেয়। এ শ্রোতা ব্যক্তি দর্শককে পূর্ণ করে তোলে। এ পূর্ণতার ফলে দর্শকদের শিল্প আস্বাদের প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ পরিণতি লাভে সক্ষম হয়।

নাটক রচয়িতা হিসাবে আমার একটি ব্যক্তিগত সংস্কারও বোধহয় ইউসুফের ক্ষেত্রে কাজ করে। আমি মনে করি, নাসির উদ্দিন ইউসুফ ছাড়া থিয়েটারে অন্য কেউ আমার বোধ ও অনুভূতিগুলো ভালো বুঝতে পারে না। আমার ভাষারীতি, শব্দবন্ধ, স্তবকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইউসুফের অবলীলাক্রমে আসা যাওয়া আছে। বলতে দ্বিধা নেই, ইউসুফের পরামর্শে আমার অনেক লেখা সংস্কার করেছি।

আজ কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল বা হাত হদাইর মতো বৃহদায়তন নাটকের দিকে পেছন ফিরে দেখি, আর কেউ বা কারো পক্ষে সেগুলো মঞ্চস্থ করা সম্ভব ছিল কি না। সেখানে সাহসী, প্রাজ্ঞ, শিল্পদ্রষ্টা একজনকেই তো দেখি- তিনি নাসির উদ্দীন ইউসুফ।

অবশ্য ইউসুফ ছাড়া জামিল আহমেদও আমার নাটকের নির্দেশনা করেছেন। চট্টগ্রামের তির্যক নাট্যদলে আততায়ী এবং চাকা। জামিল আহমেদের চাকা 'দ্য হুইল' নামে অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে।

ইউসুফের পরে নির্দেশক হিসাবে জামিল আহমেদের নাম উল্লেখ্য। ঢাকায় জামিল এক ভিন্ন মাত্রার থিয়েটার উপহার দিয়েছেন।

এ কথাও ঠিক যে, ঢাকা থিয়েটার ছাড়া অন্য কোনো দলকে নাটক দিতে আমার সংকোচ হয়। মনে হয়, সরোদের কোনো তার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় শেষে।

বাংলা নাটকে গোড়া থেকেই একটি আঙ্গিকের সংকট রয়েছে। এর ফলে বাংলা নাটকের রঙ্গমঞ্চে নাটক ও থিয়েটার ভিন্ন দুটি স্রোতের সৃষ্টি করেছে। অনেক ভালো নাটকও মঞ্চ সফল হয়নি। ফলে বিদেশী নাটকের প্রতি সব সময়েই একটি টান রয়ে গেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা নাটক যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। এ থেকে মুক্ত হবার উপায় কি?

সেলিম আল দীন : বাংলা নাটকের আঙ্গিকের সংকট মধ্যযুগে আদৌ ছিল না। সে কালে পাঁচালি ও নাট্যগীতের দুটো প্রধান ধারা দেখা যায়। পাঁচালি ছিল দু'ধরনের-একটি কৃত্যমূলক, অন্যটি প্রণয়োপাখ্যানমূলক। নাট্যগীতের ধারাও ছিল দুটি- একটি উৎসব বা সাধারণ নৃত্যগীতমূলক, অন্যধারা আখ্যানমূলক- যেমন শা বারিদ খাঁর বিদ্যাসুন্দর। বাংলা নাটকের আঙ্গিক সংকটের শুরু আধুনিক কাল থেকে। উনিশ শতকের নাট্যকারদের অনেকে ভাবলেন- ইংরেজি বা ফরাসি নাটক অথবা সংস্কৃত নাটকের মতো সংলাপ দৃশ্য ও অঙ্ক বিভাজন না থাকলে নাটক হবে কী করে। এ ধরণের আঙ্গিক সংকট ঢাকা থিয়েটারের নাট্যসাধনায় কথানাট্য পর্যায়ে খানিকটা দূরীভূত হয়েছে।

অধ্যায় : আট

উৎপাদন সংস্কৃতি

প্রাচীনকালে অন্যসব প্রাণীর মতো মানুষের একমাত্র চাহিদা ছিল আহার যোগাড় করা। কিন্তু উৎপাদন যন্ত্র আবিষ্কার এবং এর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ পশু থেকে পৃথক হয়ে যায়। এরপর নিজের আদিম অবস্থা থেকে যতই অগ্রসর হয়েছে ততই মানুষের জীবনের অর্থ হয়ে উঠেছে গভীর ও বিস্তৃত। সে তার উৎপাদনের হাতিয়ার ক্রমাগত শাণিত করে তুলেছে। মানুষ শুধু বেঁচে থাকার নিরাপত্তা নিয়েই তৃপ্ত নয়; জীবনের মান ও শ্রম দক্ষতাকে আরো উন্নত করার জন্য নিরন্তর সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে।

মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ক্রমশ বেড়েছে। উদ্ভাবন করেছে উন্নয়নের নতুন নতুন পদ্ধতি। বদলে গিয়েছে সমাজ। কিন্তু সমাজের বেশিরভাগ মানুষ উৎপাদনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। যারা প্রথম পশু পালন করেছে, তারা খেতে পেয়েছে উন্নততর খাদ্য। খাদ্য তাদের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়িয়েছে। ফলে তাদের পক্ষে উন্নতমানের কলকব্জা ও হাতিয়ার উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।

পশু পালন শুধু খাদ্যের অভাব দূর করেনি। সেই সঙ্গে লাঙল দিয়ে জমি চাষের উপায় উদ্ভাবনে সহায়তা করেছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মানুষের পক্ষে চিন্তা করার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। এতে তৈরি হয়েছে সভ্যতা সৃষ্টির নতুন পটভূমি। পেশি শক্তির ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে পশুশক্তির

ব্যবহার। এতে শ্রম লাঘব হয়েছে। পরে মানুষ বাতাসের শক্তি ব্যবহার করেছে। এর উদাহরণ পালতোলা নাও। এর অনেক পরে শুরু হয়েছে বাষ্প ইঞ্জিনের ব্যবহার। এতে পেশিশক্তির ব্যবহার হ্রাস পেলেও উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ। মানুষের হিসাবের খাতা হয়ে উঠেছে সমুন্নত ধারণার প্রতীক।

গণিতের শুরু গণনা দিয়ে। মানুষ যখন পশু পালন করেছে, তখনো পশু পালনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সংখ্যা। পশুগুলো ভেড়া কিংবা গরু হোক, গণনার পদ্ধতি একই। একেক ভাষায় ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন একেক রকম। কিন্তু সকল ভাষায় গণিতের ভাষা একই। যেমন, দুই যোগ দুই সমান চার। এটা বিশ্বের সর্বত্র একই। এ কারণেই অঙ্কের ভাষা সব দেশেই বোধগম্য। অঙ্ক বিশ্বকে একাকার করে দিয়েছে। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে যোগাযোগের নতুন বিশ্ব। কম্পিউটার ভৌগোলিক সীমানা ভেঙে প্রবেশ করেছে বিশ্বের বিস্তৃত অঙ্গনে।

প্রযুক্তি ও মানুষ মুখোমুখি হওয়ার ফলে প্রাচীন বিশ্বাসে ভাঙন ধরেছে; কিন্তু নতুন বিশ্বাসের সুফল সাধারণ মানুষ পায়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগ, এমনকি বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ কৃষকই বিশ্বাস করে ঈশ্বর বৃক্ষের জন্ম দেয়। কিন্তু প্রযুক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসে ভাঙন শুরু হয়। আজ মানুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, যন্ত্র মানুষের সৃষ্টি এবং তা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করে। এ ধরণের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে শিখেছে, তারা এমন এক বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, যা তাদের কল্পনারও বাইরে অথচ বাস্তব। এর গতি অপ্রতিরোধ্য। যেমন একটি টেলিভিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আলো ও রঙের সাহায্যে একজন ব্যক্তিকে কোটি ব্যক্তিকে পরিণত করা যায় এবং তা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেয়া যায়। এভাবে মানুষ বিস্ময়কর বিজ্ঞানের কাছে নত হয়েছে এবং নিজেদের জীবনে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করেছে। অথচ তারা অনেক পুরোনো বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে পারেনি।

কম্পিউটারে কর্মক্ষমতা সম্পর্কে কৃষকদের বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। পেশিচালিত লাঙল কিংবা যন্ত্রচালিত লাঙল সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সুদৃঢ়। কারণ, এখনো ফসল উৎপাদনে কম্পিউটারের ব্যবহার হয়নি। ফসলের হিসাবও তারা কম্পিউটারের সাহায্যে করে না। একজন রোবট কৃষক আবিষ্কার কি সম্ভব? হয়তো সম্ভব। তাই 'রোবট কৃষক' নিয়ে কেউ কেউ ভাবছে। ভাবলেও এর সুফল কোনো জমির মালিকের কাছে পৌঁছেনি।

কম্পিউটারের অভ্যন্তরে থাকে ইলেকট্রনিক বর্তনী। বর্তনীগুলো পরিচালিত হয় কিছু সংকেতের মাধ্যমে। সংকেত যায় ডাটা আকারে। এ জন্যই

কম্পিউটার পরিচালনার জন্য বিশেষ ভাষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কৃষকের ভাষা সাধারণ। একজন নিরক্ষর মানুষও ভালো কৃষক হতে পারে। সে নিজের উৎপাদনের হিসাব নিজেই বুঝে নিতে সক্ষম। এ কারণে একজন কৃষকের কাছে বৈষয়িকভাবেই একটি কম্পিউটারের চেয়ে লাঙলের দাম বেশি। পেশিচালিত লাঙলের চেয়ে যন্ত্রচালিত লাঙল বেশি কার্যকর। কিন্তু এটা তার ক্রয় সীমার বাইরে। আমাদের সমাজে পুরোনো উৎপাদন যন্ত্রগুলোর মতো পুরোনো বিশ্বাসও টিকে আছে। অদৃশ্য মানব বা টাইম মেশিনের মতো বাস্তব ঘটনাও মানুষের মন থেকে ভূতের ভয় মুছে দিতে পারেনি। এর কারণ, বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই আস্তিক এবং তারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মের উপর আস্থাশীল। জৈবশক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ প্রযুক্তি জ্ঞানের বাইরে বলেই মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়েও এ কথা সত্য, মৃত্যু হচ্ছে প্রাণীর অনিবার্য পরিণতি। মানুষ নিজেকে এবং চারপাশের পরিবেশকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন অধিক পরিমাণে বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা। কারণ, উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল গরিব মানুষ পায়নি।

উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে রয়েছে পুঁজির বিকাশ। পুঁজি এসেছে ধনীদের কাছ থেকে। উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধা তারাই ভোগ করেছে। গরিব দেশগুলোর দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে অনেক সময় প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবকে দায়ী করা হয়। কিন্তু এ বক্তব্যের যুক্তিসংগত প্রমাণ নেই। বিপুল জনসংখ্যার দেশ জাপান সমুদ্রবেষ্টিত, পর্বতসঙ্কুল, অনুর্বর এবং দেশটিতে খনিজ সম্পদ ও জ্বালানি তেল নেই। তা সত্ত্বেও দেশটি উন্নত। জমিতে একর প্রতি ফলন বেশি। প্রযুক্তি বিকাশের সাফল্য দেশটিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দক্ষ জনশক্তির অভাবে আমরা অনেক যন্ত্রপাতিই দেশজ উৎপাদন কাঠামোর মধ্যে লাগসইভাবে ব্যবহার করতে পারিনি। বরং এ ধরনের প্রযুক্তি আমদানির ফলে আমাদের পুঁজি বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে মূলধন সংকট।

যুগমানসের প্রয়োজনে উৎপাদন যন্ত্রের পরিবর্তন যেমন অনিবার্য হয়ে ওঠে তেমনি প্রাচীন দর্শন, ঐতিহ্য ও ইতিহাস পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দরিদ্র দেশের বেশির ভাগ গবেষকই তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও দর্শনকে উন্নত বিশ্বের সাম্প্রতিক দর্শনের চেয়ে উন্নততর হিসাবে প্রচার করে থাকেন। এ শ্রেণীর গবেষকরা সাধারণত লোকসাহিত্য পুনরুদ্ধারের গবেষণাকে প্রধান কাজ বলে মনে করেন। এসব লোককাহিনীর বেশির ভাগ উপাদানই প্রেমনির্ভর।

প্রকৃতপক্ষে যে কোনো দেশের লোককাহিনীতে অনুরূপ প্রেমের উদাহরণ রয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় এটি-ই স্বাভাবিক।

মানব সভ্যতা এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষের জন্য বিজ্ঞানকে আমরা যে মর্যাদায় বসিয়েছি, কম্পিউটারের মর্যাদা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং তথ্য সংরক্ষণকারী যন্ত্র হিসাবে এর অবস্থান সব কিছুর ঊর্ধ্বে। কম্পিউটার শ্রম নিবিড় শিল্পগুলোকে হালকা শ্রমিকের কর্মস্থলে পরিণত করেছে। ফলে অনেক শ্রমিক কর্মস্থল থেকে উৎখাত হয়েছে। কিন্তু কৃষিখাতে কৃষকদের অবস্থান অটুট রয়েছে। মুদ্রণ শিল্পে কম্পিউটারের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলোর বেশিরভাগই কম্পিউটারে কম্পোজ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠা সাজানো, ভুল সংশোধন, বিষয় সংরক্ষণ ও স্থানান্তর ইত্যাদি সহজ করেছে। এর ফলে হ্যান্ড কম্পোজ ও লাইনো মেশিন উঠে গিয়েছে। কিন্তু কম্পিউটার কৃষিখাত থেকে কোনো উৎপাদন যন্ত্র উৎখাত করতে পারেনি। অথচ আমদানি-রফতানি কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সারা বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে কম্পিউটার। যে সব ব্যবসায়িক কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মজুদ নিয়ন্ত্রণ, টিকেট বুকিং, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা সংরক্ষণ, পণ্যের পরিমাণ নির্ণয় ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি বছর ক'জন কৃষক কটি লাঙল হারাচ্ছে এবং সেখানে ক'টি ট্রাক্টর প্রবেশ করছে, কম্পিউটারে তার হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি।

আধুনিক সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি নির্মিত হয়েছে প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকাঠামোকে কেন্দ্র করে। প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতে। তারা পুরোনো বিশ্বাসগুলো টিকিয়ে রাখতে চায়। নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে ভয় পায়। একজন ব্যবসায়ী কখনো শিল্পপতি হবার ঝুঁকি নিতে চায় না। কারণ, তারা দীর্ঘকালব্যাপী এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুনাফা, শোষণ ও শাসন অব্যাহত রেখেছে। নতুন ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর শক্তি হিসাবে আসতে পারে। মানুষ যে আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণ নির্মূল করার অঙ্গীকার নিয়ে আসে, তা আরেকটি শোষক শ্রেণীর জন্ম দিতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রচলিত ব্যবস্থায় নতুন সরকার মানুষের জন্য নতুন দুর্ভোগ বয়ে আনে। আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও নতুন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন কার্যকর থাকলে পুরোনো দুর্ভোগের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ চক্রের মধ্যে পড়ে দরিদ্র কৃষকরা নিঃস্ব হয়।

সমাজ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যা রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। সমাজের নতুন বিন্যাসের মধ্যেও পুরোনো উৎপাদন ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় কার্যকর থাকে। এটিই হচ্ছে শোষিত মানুষের বড় দুর্ভাগ্য। কোনো কিছু বুঝা এবং তাকে সত্যিকারভাবে কাজে লাগানোর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকে। এ জন্যই প্রয়োগের চেয়ে চিন্তা সহজতর এবং তা মানুষের মনে দ্রুত সঞ্চারিত হয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, দরিদ্র দেশে লাগসই প্রযুক্তি অনুন্নত প্রযুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত অর্থে লাগসই প্রযুক্তি কোনো অনুন্নত কারিগরি কৌশল নয়। বরং অনুন্নত কারিগরি কৌশল থেকে শুরু করে যে কোনো প্রযুক্তি একটি দেশের জন্য লাগসই প্রযুক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। একটি দেশে সেকেলে উৎপাদন পদ্ধতির পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে পারে। উন্নয়নশীল দেশেও পশুচালিত লাঙলের পাশাপাশি যন্ত্রচালিত ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

প্রযুক্তি সমাজকে গ্রাস করে তার নিজের শক্তিতে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার যেমন নিশ্চিতভাবে আয়ের অসমতা দূর করার সূত্র হিসাবে কাজ করে না, তেমনি একটি দেশের উচ্চতর প্রযুক্তির ব্যবহার প্রমাণ করে না দেশটি ধনী। একটি দেশ গরিব হলেই যে সাংস্কৃতিকভাবে দরিদ্র থাকবে এমন কোনো কথা নেই। দরিদ্র মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকার বোধ প্রখর। একটি জাতি শুধু ভৌগোলিক কারণে দরিদ্র হয় না। বরং অসাম্য, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতনই একটি দেশের দারিদ্র্যের মূল কারণ। এ দারিদ্র্যই দক্ষ জনশক্তিকে অদক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে।

যান্ত্রিক উৎপাদন প্রথা কারিগরি উৎপাদন প্রথাকে অচল করে দিয়েছে। ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কৃষিনির্ভর শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কৃষি উৎপাদনে পুঁজি নিবিড় করেছে। একই সঙ্গে দক্ষ কৃষিশ্রমিককেও উৎখাত করেছে জমি থেকে। কৃষিতে ধনতান্ত্রিক পুঁজি বিকাশের ফলে গরিব কৃষকের জমি ধনী কৃষকের হাতে চলে গিয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা।

নিজের সংস্কৃতিকে গায়ের জোরে শ্রেষ্ঠ বলে চালানোর অর্থ হচ্ছে অন্যের উন্নততর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল নির্মাণ করা। এটি অবশ্যই চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে আত্মবিনাশী সিদ্ধান্ত। পুঁজি যেমন পুঁজি গঠন করে, তেমনি দারিদ্র্য আরো দারিদ্র্য ডেকে আনে। দরিদ্র ক্রেতাদের লক্ষ্য করেই নির্মাণ করা হয়েছে পুঁজি নিবিড় সার, কীটনাশক, সেচ পাম্পসহ বিভিন্ন কৃষি

উপকরণ উৎপাদনের কারখানা। কিন্তু গরিব কৃষকদের পুঁজিকে সংগঠিত করে সমবায় পদ্ধতিতে পুঁজি গঠনের প্রয়াস গরিব দেশগুলোতে নেই। ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশের ধনিদের জন্যই ঋণ দেয়। ফলে আমাদের দেশের গরিব কৃষকের হাজার বছরের পুরোনো লাঙলের ফলাটি বদলানো সম্ভব হয়নি। তবে অন্ধকার গ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করেছে বিদ্যুৎ এবং শিক্ষার আলো। কিন্তু এর নিয়ন্ত্রণ গরিবদের হাতে নেই। অনেক সময় এমনো দেখা গিয়েছে, বিদ্যুতের অভাবে জমিতে ধানের চারা শুকিয়ে গিয়েছে। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, এতসব বিশৃঙ্খলার মধ্যে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। এ উন্নয়ন সাধারণ মানুষের কৃত্রিম চাহিদা বাড়িয়ে তুলেছে। মানুষের চাহিদা যত বেড়েছে, মানুষ তত বেশি উৎপাদনমুখী হয়েছে। এ কারণেই একটি দেশে যত দ্রুত প্রযুক্তি প্রবেশ করেছে, সে দেশের মানুষ তত দ্রুত সংস্কৃতিবান হয়েছে।

পৃথিবী ও মানুষের মধ্যে এমন একটি আন্তর্নিহিত সংহতি রয়েছে, যা মানুষকে শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাঁচতে শেখায়। জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনেই মানুষের জৈবিক ও মানবিক বিকাশের একটি সম্পূরক অবস্থান তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী দেয়াল রয়েছে। এর ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি হয়েছে। বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি হয়ে উঠেছে উৎপাদনের অনুষঙ্গ। প্রযুক্তি এমন একটি উন্নত পদ্ধতি, যা মানুষের কৃত্রিম চাহিদা বাড়িয়ে তোলে। ফলে সমাজে অনেক জিনিসের বাহুল্য ঘটে। যেমন- আগে আমাদের দেশে রঙিন টিভি কিংবা কম্পিউটারের চাহিদা ছিল না; এখন এর নতুন চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এবং তা অপ্রতিরোধ্যভাবেই বেড়ে চলেছে। নতুন প্রযুক্তির আগ্রাসনে পুরোনো প্রযুক্তি সেকেলে হয়ে গিয়েছে।

একটি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র, গণতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। যেমন বাস থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক সভ্যতাকেও মধ্যযুগীয় সভ্যতায় রূপান্তর সম্ভব নয়। এ কারণেই প্রাচীন সভ্যতার লৌহযুগ প্রস্তর যুগে পরিণত হয়নি।

মানব প্রজাতির বিকাশের সঙ্গে প্রযুক্তি বিকাশের একটি সম্পর্ক রয়েছে। চার্লস ডারউইন তার 'অরিজিন অব স্পেসিস' গ্রন্থে উদ্ভিদ ও প্রাণী বিকাশের নতুন তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তার রচনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যোগ্যতমের টিকে থাকা, প্রাকৃতিক নির্বাচন, স্বাভাবিক নির্বাচন কিংবা এ

ধরনের কিছু বক্তব্য। এঙ্গলস বলেছেন, শ্রমই হচ্ছে মানব রূপান্তরের মূল কারণ। শ্রম ও বাচনভঙ্গির কারণে শ্রমের অবলম্বন হিসাবে হাত এবং ঋজু চলনভঙ্গির প্রভাবে পদযুগলের বিকাশ ঘটেছে। মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষের ভূমিচারণের সময় দেহভার বহনের দায় থেকে মুক্তি না ঘটলে তার আনুষঙ্গিক বিকাশও ব্যাহত হতো। পরিবেশ যেমনই হোক, বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য প্রাণীর নেই। তবে যুদ্ধ- বিগ্রহের মাধ্যমে মানুষ তার পতনও রচনা করেছে।

প্রত্যেক রাজনৈতিক বিপ্লবের পেছনেই পুরাতন শাসকগোষ্ঠী থাকে, যাদের উৎখাতের মাধ্যমে জনগণ নতুন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে। কিন্তু প্রযুক্তির রূপান্তর এ প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। রুশ বিপ্লবের স্লোগান ছিল- শান্তি, রুটি ও জমি। এ স্লোগানের মাধ্যমেই রাশিয়ান জনগণ তাদের অভাববোধ ও দাবিগুলো উত্থাপন করেছিল। এর বিপরীত স্লোগান ছিল- যুদ্ধ, অনাহার ও গোলামি। এ স্লোগান হচ্ছে প্রাচীন শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের প্রতীক। এর বিপরীতে প্রযুক্তি বিকাশের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় পারমাণবিক বিভাজন হচ্ছে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ডেনমার্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফসল। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সংস্কৃতিকে এভাবে সীমাবদ্ধ করা যায় না। প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী সমাজগুলোর কাছেও প্রযুক্তির নতুন বিকাশ অগ্রহণযোগ্য নয়। একটি ট্রাক্টর ও একটি লাঙলের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা যেকোনো সচেতন লোকের কাছেই স্পষ্ট। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতিকে এভাবে পৃথক করা যায় না।

অব্যাহত দাস বিদ্রোহের ফলে রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছে। এরপর সৃষ্টি হয়েছে ভূমিদাস প্রথা। একই সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়েছে। ভূমিদাসকে জমি ও হাল দেয়া হতো। কিন্তু সে জমির মালিক ছিল না। আধুনিক কৃষকরা স্বাধীন। সে জমির মালিক, বর্গাচাষী কিংবা ক্ষেতমজুর।

ইংরেজ আমলে বিশ হাজার একর জমি মালিকের সংখ্যা ছিল পাঁচশ' কিংবা এর চেয়ে সামান্য বেশি। এরপর গ্রামীণ কাঠামোতে সৃষ্টি হয়েছে কয়েক লাখ টাউট। নগর থেকে গ্রামে টাকা যায়, কিন্তু তা জমির উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় না। বরং তা ব্যয় করা হয় জমি ক্রয়ে। সেই জমি হস্তান্তরিত হয়ে যায় অকৃষকের হাতে। তাদের জমি চাষ করে বর্গা চাষীরা। গ্রামের জমির ক্রেতা কৃষক নয়; ব্যবসায়ী কিংবা চাকরিজীবী। কারণ জমির উদ্বৃত্ত আয় থেকে

জমি কেনা যায় না। প্রবাসীদের জমি কেনা-বেচার হারও কৃষি খাতকে নতুন প্রেক্ষিত দান করতে পারেনি। কৃষকের হালের বলদের স্থান দখল করে নিয়েছে ট্রাক্টর। হালের বলদ ও কাঠের লাঙল হয়েছে অপসারিত।

আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশি হারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নগরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ফলে গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামো ভেঙে গিয়েছে। শ্রমের ফসল হিসাবে যে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন হয়েছে, সে পণ্যের উপর গরিব কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে দারিদ্র্য তার জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের মূল বাণী ছিল- সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। সেখানে প্রচার করা হয়েছে, যেখানে ইভ সুতা কাটে এডাম মাটি খোঁড়ে, তাহলে অভিজাত কে?

বহু বিপ্লব ও বিদ্রোহ সংঘটিত হবার পরও গরিব ও অভিজাতের ব্যবধান অবলুপ্ত হয়নি। বরং পুঁজি গঠনের ব্যাপক প্রক্রিয়ার মধ্যে গরিব ও ধনীর পার্থক্য বেড়েছে। কৃষকের দখলে যখন জমি থাকে তখন সে অন্যের কাজে যায় না। যে কারিগরের হাতে উৎপাদন যন্ত্র রয়েছে, সে অন্যের কাছে কাজ প্রার্থী হয় না। কৃষকের দখলে যখন জমি থাকে না, কারিগরের হাত থেকে উৎপাদন যন্ত্র হাতছাড়া হয়, তখন তারা কাজের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হয়। কাজেই শ্রমশক্তি বিক্রয়ের বাজারে শ্রমিক উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন। পুঁজিবাদী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদন উপকরণের উপর ব্যক্তি পুঁজির নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনের উপকরণ থেকে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা ও মজুরিভিত্তিক শ্রম বিনিয়োগ, শ্রমের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সৃষ্টি, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার শ্রমিক একজন স্বাধীন মানুষ, দাস যুগের মতো মালিকের গোলাম নয়। কিন্তু সে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সুবিধা পায় না। জীবিকা নির্বাহ করার মতো যার জমি, যন্ত্র বা কারখানা নেই, তার পক্ষে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা কঠিন ব্যাপার। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় একজন দরিদ্র মানুষ নিজেকে বিক্রি করে না বটে, তবে সে বিক্রি করে নিজের একমাত্র সম্পদ- শ্রমশক্তি। উৎপাদন যন্ত্রগুলো যত দক্ষ হয়, শ্রমিক তত বেশি উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। নতুন প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করে ভালো ফল লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত মূল্যে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ এবং বাড়তি ফসল বিপণনের ব্যাপারে নিরক্ষর কৃষকের

চেয়ে শিক্ষিত কৃষকরা অধিকতর দক্ষ। যেহেতু ছোট কৃষক ও বর্গাচাষীরা কম শিক্ষিত, সে কারণে তারা শিক্ষিত কৃষকদের চেয়ে কম সুফল লাভ করে।

একটি সমাজে নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এর সুফল সবচেয়ে আগে লাভ করে ধনীরা। সময়ের ব্যবধানে ছোট কৃষকরা আরো বেশি নিঃস্ব হয়। সম্পদের দখল নিয়ে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের ফলে যে সামাজিক কাঠামো সৃষ্টি হয়, তা উৎপাদনের নতুন কৌশল সৃষ্টি করে। পুরোনো উৎপাদন প্রথা অচল করে দেয়। এতে গরিবরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি।

অধ্যায় : নয়

কৃষকের প্রতিকৃতি

সিন্ধু নদের উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা। জনপদগুলো ছিল বালুকাময়। এ সময়ের সবগুলো জনপদই গড়ে উঠেছিল মরুভূমির বালুকাময় নদীর তীরে। কারণ, পানির উৎস ও খাদ্যের সহজ প্রাপ্তি। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল কৃষক। তারা জানত সেচ ব্যবস্থা। সিন্ধু সভ্যতার বণিকরা খাল খনন করে যেত মেসোপটেমিয়াতে। সেই সভ্যতায় ছিল পুরোহিত, বণিক ও কৃষক। শুধু কৃষকরাই ছিল উৎপাদক শ্রেণী। তারা বাড়তি উৎপাদন করত পুরোহিত ও বণিকদের জন্য। গাঙ্গেয় উপত্যকায় অনার্য জনপদগুলোয় আর্যরা প্রবেশ করে উর্বর কৃষি ক্ষেত্র দখল করে। কৃষি অর্থনীতিতে গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা। অর্থাৎ কৃষকের শ্রমের উপর শক্তিধরের দখল।

কৃষি সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে মানুষ। কারণ, শিকারীদের অপেক্ষা কৃষকরা দশ গুণ বেশি মানুষের জন্য আহার যোগাড় করতে পারত। শিকারীরা ছিল যাযাবর। আর কৃষকরা ছিল স্থায়ী বাসিন্দা। স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনকারীদের হাতে লাঙল ভিত্তিক কৃষি সভ্যতার সূচনা ঘটে। শিকারীরা ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী। কৃষিজীবীরা ছিল খাদ্য উৎপাদক। তারাই সৃষ্টি করেছে উদ্বৃত্ত সম্পদ। কৃষক বনভূমি পরিষ্কার করে কৃষি জমির পত্তন করতে চেয়েছে। কৃষির আবিষ্কার মানব সভ্যতার যুগান্তকারী ঘটনা। কৃষকরাই হচ্ছে সভ্যতার স্রষ্টা, যুদ্ধে বিজয়ী এবং শক্তিমান। তারাই ইতিহাসের ধারাবাহিক মানুষ।

কৃষকদের চেহারা আসলে কেমন! জয়নুল আবেদীন গ্রামের মানুষের চেহারা এঁকেছেন কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে। সুলতানের শিল্পকর্মে কৃষক হচ্ছে একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ। কিন্তু গ্রামের সাধারণ বর্ণনায় আমাদের চোখে ভেসে ওঠে একজন রুগ্‌ণ মানুষ গরু ও আড়াই হাজার বছরের পুরানো লাঙল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। শিশুপাঠ্য পুস্তকে লেখা হয়েছে, 'গণি মিয়া একজন গরিব কৃষক। সে মেয়ের বিয়ে ধুমধাম করে দিয়েছে। তাই ঋণের জালে জড়িয়ে গিয়েছে।' এসব বর্ণনাই হচ্ছে কৃষক চরিত্রের প্রতীকী প্রকাশ।

ব্রিটিশ সরকার গঠন করেছিল একটি কমিশন। কমিশন তখন জমিতে সকল মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, খাজনা হ্রাস, প্রজাদের স্বত্বাধিকার দান, জমির সর্বোচ্চ মালিকানা নির্ধারণ, জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা রোধ এবং সমবায় খামার গঠনের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু ইংরেজরা তা কার্যকর করেনি। করতে পারেনি।

ষাটের দশকের দিকে যখন চালের উপর বেশি চাপ পড়ে, তখন কৃষকরা বিকল্প খাদ্য শস্যের সন্ধান করতে থাকে। তখন থেকেই শুরু হয় গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদির চাষ। ভুট্টা ও যবের চাষ তেমন জনপ্রিয় হয়নি। রেডিও'র কল্যাণে তখন থেকেই এদেশে রুটি খাওয়া শুরু হয়। ধানের বিকল্প ফসল হিসাবে গমের চাষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ষাটের দশকে একটি স্লোগান ছিল 'ধানের পাশাপাশি গম চাষ করুন।' রেডিও'র মাধ্যমে তা ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। এদেশের কৃষকরা গম চাষ সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

বাংলাদেশের উর্বর জনপদে যা ফলানো হয় তাই ফলে। কৃষি কৌশল পরিবর্তনের ফলে কৃষি খাতে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তারা সহজাত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কারণেই উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন আত্মস্থ ও প্রয়োগ করে। তারা সামান্য জমিকে কেন্দ্র করেই টিকিয়ে রাখে তাদের জীবনধারা। কৃষি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বিপ্লব সংঘটিত হয়।

গ্রাম-বাংলার নিরক্ষর জনগণের মধ্যে রেডিও'র ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সকলের সামনে তুলে ধরা এবং অবসর মুহূর্তগুলোকে আনন্দমুখর করে তোলা। নিছক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারই রেডিও'র উদ্দেশ্য নয়। বরং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার ও তথ্য পরিবেশনে এর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

এদেশের কৃষকরা নিরক্ষর। কৃষি বিষয়ক বুকলেট তাদের পক্ষে পড়া সম্ভব হয় না। কাজেই শ্রুতি মাধ্যম হিসাবে এক সময় শুধু রেডিও'র প্রভাব তাদের

জীবনে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল। কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলো তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, এখনো শোনেন। রেডিও'র মাধ্যমে মজিদের মা গ্রামীণ সমাজে একটি প্রতীক চরিত্রে পরিণত হয়েছিল।

১৯৬৪ সালে স্থাপিত হয়েছে টিভি সম্প্রচার কেন্দ্র। এর আগে নিরক্ষর কৃষকদের কাছে তথ্যের বাহন হিসেবে রেডিও-ই ছিল একমাত্র ভরসা।

কৃষি কাজ হচ্ছে একটি অনুকরণের পেশা। কৃষকরা এই পেশা আত্মস্থ করেছে পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে। কৃষকের ছেলে কৃষি কাজ শিখেছে তার বাবার কাছ থেকে। অথবা তার আত্মীয়দের কাছ থেকে।

১৮৬০ সালের দিকে ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃষি শিক্ষার জন্য কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আমাদের এই অঞ্চলে ১৯০৫ সালে কৃষি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রথম কৃষি শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর তা অনিবার্য কারণে বন্ধ হয়ে যায়। কৃষি শিক্ষার ভিত্তিই ছিল কৃষকদের অভিজ্ঞতা। ১৯২২ সালে ঢাকাতে একটি কৃষি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালের আগে কৃষিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কার্যকর ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম কৃষি কলেজ থেকে প্রথম কৃষি গ্রাজুয়েট বের হয়।

শত শত বছর ধরে এ অঞ্চলে কৃষি কাজ হয়ে আসছে অনুকরণের মাধ্যমে। এটা পরস্পরের অভিজ্ঞতা বন্টনের পেশা। কৃষকরা অন্যের কাছ থেকে উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। বরং তারা নিজেদের জমি চাষের উপযোগী করে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেছে। একজন সার্থক কৃষকই আরেকজন কৃষকের শিক্ষক। তারা কখনো উন্নত ফসলের খবর পেলে সেই অঞ্চলে গিয়ে উন্নত ফসল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং বীজ সংগ্রহ করে। সেই বীজ ছড়িয়ে দেয় নিজেদের অঞ্চলে। উন্নত ফসলের খবর পেলেই তারা তা হাটে-বাজারে গিয়ে আলোচনা করে। সেখান থেকেই খবর ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে।

কৃষকরা নিজেরা অভিজ্ঞতা থেকে উন্নততর বীজ সংগ্রহ করেছে। বিশ্বে দশ হাজারেরও বেশি জাতের ধান রয়েছে। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা প্রায় চার হাজার ধানের বীজের নাম সংগ্রহ করেছেন। এসব বীজ খেয়ালের বশে আবিষ্কৃত হয়নি। বরং মাটি ও আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করেই জমির বীজ নির্বাচন করা হয়েছে। একেক ঋতুতে কৃষকরা একেক ধরনের ধান চাষ করেছে। কোনো কোনো সময় দেখা গিয়েছে, একজন কৃষকই দশ-বার রকমের ধান ফলিয়েছে।

একসময় এদেশে জলি আমন ধানের চাষ হতো। বর্ষার পানি থেকে ধানকে রক্ষা করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এসব ধান শুকানো জমিতে বপন করা হতো এবং বর্ষার পানি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এসব ধান পাকত। বন্যার পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লকলক করে বেড়ে উঠত ধান। সেসব ধানের বীজ এখন পাওয়া যায় না। ইরি চাষ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে জলি আমন চাষের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। কৃষকের চাষের জমিতে গিয়ে কেউ তাকে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ শেখায়নি। তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেই ধানের চাষ শুরু করেছে। এ ব্যাপারে গণমাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

গণমাধ্যমের কাজ হচ্ছে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলো নিরন্তর প্রকাশ করার মাধ্যমে জাতির সম্পদ করে তোলা। তথ্য প্রকাশের মাধ্যমেই গণমাধ্যম বেঁচে থাকে। গণমাধ্যমে সংবাদ হিসাবে যা প্রচারিত হয় তাই সমসাময়িক কালের জ্ঞান ভাণ্ডার কিংবা ভবিষ্যতের ইতিহাস হয়ে ওঠে। এফ, ফ্রেশার বন্ড বলেছেন, 'সাংবাদিকতার অস্তিত্বের পেছনে চারটি প্রধান কারণ রয়েছে। যেমন, তথ্য অবগতি; তথ্য বিশ্লেষণ; নির্দেশনা দান এবং চিত্ত বিনোদনের উপাদান সরবরাহ করা। এইচ জি ওয়েলস একবার বলেছিলেন, 'রোমান সাম্রাজ্যে কোনো খবরের কাগজ ছিল না। রাজধানীর চলাচল সম্পর্কে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সাম্র্যাজ্য টিকে থাকতে পারেনি।'

আমাদের কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে এমন কতগুলো অভাবিত পরিবর্তন এসেছে, সেগুলোর পেছনে গণমাধ্যমগুলোর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ষাটের দশকের সূচনায় এদেশে যে সবুজ বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তার পেছনে রেডিও'র ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। উন্নত বীজ, সার ও সেচ পাম্প ব্যবহারের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করে তোলার জন্য রেডিও ব্যাপক প্রচার কার্য পরিচালনা করে। 'নিজে স্বনির্ভর হোন এবং দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলুন'-এ ধরনের স্লোগান ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই সময়েই কৃষকরা রাসায়নিক সারের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে।

ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে এসে কৃষকরা ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি সার ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবগত হয়। ১৯৫১-৫২ সালের দিকে কিছু কিছু সার সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের বিজ্ঞানীরা পরিচিত ছিলেন। এগুলোর গুণাগুণ সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার ব্যাপারে তাদের ব্যাপক

দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কৃষকদের তেমন কোনো সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

১৯৬২ সালের জুলাই মাসের দিকে রাসায়নিক সার বিতরণের দায়িত্ব পড়ে কৃষি উন্নয়ন সংস্থার উপরে। এই সংস্থাটিই ষাটের দশকে গ্রাম ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে ডিলার নিয়োগ করে। কিন্তু সার ব্যবহারের গুণাগুণ সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটি তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তখন কৃষকরা উন্নত প্রযুক্তির গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য রেডিও'র উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করত।

উন্নত বীজ ও সেচ পাম্প ব্যবহারের হারও একই হারে বেড়েছে। এখন সারা দেশ জুড়ে যে উন্নত জাতের ফসল আবাদ হচ্ছে, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রধান ভরসা ছিল রেডিও। এদেশের কৃষকরা নিরক্ষর। কিন্তু কৃষির উন্নততর প্রয়োগের জ্ঞানকে আত্মস্থ করার ব্যাপারে তাদের রয়েছে অপিরিসীম দক্ষতা। কৃষকদের কাছে জটিল প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত টি আমন, টিএসপি কিংবা এমপি শব্দের অর্থ স্পষ্ট। তারা বোঝে বলেই কৃষি খাতে সৃষ্টি হয়েছে নীরব বিপ্লব।

কৃষকদের সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে জমি পরিচর্যার কৌশল। একজন সাধারণ কৃষকও জানে, আমাদের মাটির নাইট্রোজেন আহরণের ক্ষমতা রয়েছে এবং নাইট্রোজনের ক্ষয়ক্ষিতও খুব দ্রুত হয়। শীম জাতীয় গাছের শেকড়ে এক জাতীয় ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, যা এ জাতীয় গাছের শেকড়ের সাহায্যে সংগৃহীত হয়ে থাকে। কাজেই শীম জাতীয় শস্যের চাষাবাদ মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধির সহায়ক। জমিতে বছরের পর বছর একই ফসলের চাষ করলে ফসলের ফলন হ্রাস পায়। একই জমিতে পর পর ধান চাষ করলে যেমন ধানের ফলন কম হয়, তেমনি পর পর পাট চাষ করলেও পাটের ফলন হ্রাস পায়। এ জন্য কৃষকরা জমিতে একটির পর আরেকটি ফসলের চাষ করে। একজন ভালো চাষী তার জমিতে সব সময় একই ফসল জন্মায় না। তারা সাধারণত এক মৌসুমে পাটের চাষ, অন্য মৌসুমে ধানের চাষ করে। এ ধরনের পর্যায়ক্রমিক চাষে অনেকগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারিতা রয়েছে–

এতে আগাছা, পোকা ও রোগ থেকে ফসল রক্ষা পায়;

মাটিতে জৈব পদার্থের ভারসাম্য রক্ষিত হয়;

জমির পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক চাষের পদ্ধতিতে গভীর ও

অগভীর শেকড়যুক্ত শস্য পালাক্রমে জন্মানো যেতে পারে। আলু, গম, ধান ইত্যাদি ফসলের শেকড় অগভীর। পাট, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের বীজ গভীর। এভাবে শস্য চাষ করলে মাটির পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। এসব তথ্য শুধু কৃষক নয়, নাগরিকদেরও অজানা নয়। জমির উপর ধান চাষের চাপ বেড়েছে। তাই কৃষকদের পক্ষে জমি পরিচর্যা করা সম্ভব হয় না।

সাংবাদিক এড ওয়ার্ড মারো এক ধরনের কৌতূহলউদ্দীপক টিভি সাংবাদিকতার প্রবর্তন করেন। তার এই উদ্ভাবনের নাম দেয়া হয়েছে 'সজীব সাময়িকী'। 'এই দেখুন' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এমন সব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন যার সঙ্গে দর্শকরা একাত্ম হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে যেন দর্শকরা সুয়েজ খাল ভ্রমণ করেছে। তারা নেমে গিয়েছে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কয়লার খনির নিকষ কালো অন্ধকারে। তেমনিভাবে বিটিভির বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকরা ঘুরে এসেছে আঙুর বাগানে, সেচ সমৃদ্ধ সবুজ জনপদে, অভিজ্ঞ কৃষকদের ঘরের দুয়ারে। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকরা সাফল্যের স্বর্ণ দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করেছেন। বিটিভির উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান যাদের কাছে বিরক্তিকর কিছু মনে হত, তারা আনন্দের সঙ্গে দেখেছে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান। প্রযুক্তির কোনো নিজস্ব ভাষা নেই। মানুষ তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েই তা বাঙ্ময় করে তোলে। এর সঠিক ব্যবহার একই সঙ্গে উন্নয়ন ও বিনোদনের উপাদান হতে পারে।

মানুষ মূলত উৎপাদক। কখনো কখনো তার সেই ভূমিকা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। রেডিও বিটিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টিভি দর্শকদের সেই অবলুপ্ত আবেগকেই জাগিয়ে তোলা হয়েছে। একজন সফল কৃষকের প্রতিকৃতির মধ্য থেকেই নির্মিত হয় হাজার হাজার কৃষকের মুখ। সৃষ্টি হয় নীরব বিপ্লব।

শায়েস্তা খাঁর আমলে আট মণ চাল বিক্রি হতো এক টাকায়। গর্বের সঙ্গে কথাটি উচ্চারিত হয়। অথচ সচেতনভাবে চিন্তা করে দেখা হয় না, একজন মেহনতি কৃষক নাগরিকদের কাছে এক টাকায় আট মণ চাল বিক্রি করতে বাধ্য হতো।

অষ্টাদশ শতকের ঐতিহাসিক বর্ণনায় বাংলাদেশকে বলা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম উর্বর জনপদ। এদেশের মসলিন ও রেশমি বস্ত্রের সঙ্গে রফতানি হয়েছে চাল, চিনি, লবণ, মরিচ, আদা, হলুদ ইত্যাদি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য। পলাশির যুদ্ধের পর পাল্টে গিয়েছে দৃশ্যপট। এসেছে নীলকর। এর আগে

কৃষকরা উৎপাদন করত পাট ও তামাক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশে তৈর করেছে জমিদার ও তার লাঠিয়াল। সম্পদ আহরণের স্বপ্ন কৃষকের জীবনকে কন্টকিত করেছে। তাদের শত্রু ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, মহাপ্লাবন, খরা এবং এদেশের কিছু মধ্যস্বত্বভোগী টাউট। এদেশের কৃষকরা জানে কিভাবে এই ভয়াবহ প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে হয়। এদেশের প্রচলিত কৃষি উৎপাদনে ঘটেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আউশ ধান চাষের জমি হ্রাস পেয়ে ইরি ও বোরো চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গম উৎপাদনে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক সাফল্য। কৃষি ও অকৃষি খাতের সমন্বয়েই এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেহারা গড়ে উঠেছে।

কৃষি খাতের মূল্য সংযোজন সাধারণ অকৃষি খাতের মূল্য সংযোজনকে অধিক হারে বৃদ্ধি করে থাকে। কৃষিকে মূলধন করে বিলেতে গড়ে উঠেছে ম্যানচেস্টার, ডান্ডি। কিন্তু এদেশে এই খাতে কেউ বিনিয়োগ করেনি। ধনী কৃষকরা নিজেদের সংগঠিত ক্ষমতা ব্যবহার করে জমির মালিকানা নির্ধারণে আরোপ করে নতুন চেতনা। এতে দরিদ্র কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়নি।

ইংরেজদের উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা এদেশে নিয়ে এসেছে পরিবর্তন। ধ্বংস হয়েছে তাঁত, চিনি ও লবণ শিল্প। তারা চলে যাবার পর রেখে গিয়েছে তাদের আমলাতন্ত্র, পরগাছাশ্রেণী ও কালো সাহেবদের। কালো সাহেব ছিল একদা জমি ও শ্রমের পাহারাদার।

এদেশের মানুষ নদীকে ভালবেসে নদীর নাম রেখেছে ইছামতি, ধলেশ্বরী, দুধ কুমার, মধুমতি ইত্যাদি। জমিদাররা কৃষকদের দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছে। নীলকরা নীল চাষের জন্য দখল করেছে কৃষকের জমি। সমতল ভূমির মানুষ কখনও পাহাড়ে যায়নি। পাহাড়ের মানুষ আসেনি এই সমতল ভূমিতে। ধারাবাহিকভাবে চলেছে এই জীবনধারা। তারা বসবাসের জন্য তৈরি করেছে কুঁড়েঘর, যাতায়াতের জন্য নৌকা। কৃষক রয়েছে মাটির টানে বাঁধা। আর গ্রামীণ নেতৃত্ব চলে গিয়েছে গ্রামবিমুখ একশ্রেণীর মানুষের দখলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে গ্রামীণ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল, কৃষি প্রযুক্তির প্রসারে তা নিয়েছে ভিন্ন রূপ। ইংরেজ আমলে ২০ হাজার একর জমির মালিকের সংখ্যা ছিল পাঁচশত। কিংবা এর চেয়ে সামান্য বেশি। এরপর গ্রামীণ কাঠামোতে সৃষ্টি হয়েছে কয়েক লাখ টাউট। নগর থেকে গ্রামে টাকা যায়; কিন্তু তা জমির উৎপাদন কাজে বিনিয়োজিত হয় না। বরং তা ব্যয় করা হয় জমি ক্রয়ে। তা হস্তান্তরিত হয়ে যায় অকৃষকের হাতে। তাদের জমি চাষ করে

বর্গাচাষীরা। গ্রামের জমির ক্রেতা কৃষক নয়; ব্যবসায়ী কিংবা চাকরিজীবী। কারণ, জমির উদ্বৃত্ত আয় থেকে জমি কেনা যায় না। অকৃষি খাত থেকে আসা পুঁজি জমির বাজার গতিশীল করে।

শ্রমিকের শ্রমের চাহিদা ওঠানামা করে মওসুম অনুসারে। আর্থিক ক্রমাবনতি তাদেরকে পরিণত করে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে। বেকারত্বের কারণে ক্ষেত মজুরের দর কষাকষির সুযোগ নেই। এই অবস্থায় কৃষি মজুরি জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না। পানি, বীজ, সার-প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি মজুরের ভাগে আসে না। ফলে কৃষি মজুরের উদ্যম, দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। আর সেই কারণেই তারা হয়ে ওঠে কর্মবিমুখ, অনেকাংশে অদৃষ্টবাদী। এই ক্ষেত্রে তারা আলস্যপরায়ণও হয়ে পড়ে। শ্রম বিনিয়োগ করে মজুরির টাকায় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না বলে ভাঙে পরিবার গঠনের মূল বুনিয়াদ। দশ বছর না হতেই অভাবি পরিবারের শিশুরা নামে কাজের সন্ধানে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ শিশু অল্প মজুরিতে কাজ করে অন্যের জমিতে। সংগ্রহ করে নিজের খাদ্য নিজেই। তাদের কাজ হয়ে ওঠে অনিয়মিত ও বিভিন্নমুখী। ফলে কোনো ক্ষেত্রেই অর্জিত হয় না শ্রম দক্ষতা। জাতির বোঝা হিসাবেই তাদের বৃদ্ধি ঘটে অদক্ষ বেকার শ্রমশক্তিতে। তাদের সুন্দর স্বপ্ন দেখার চোখ ছেয়ে যায় অন্ধকারে। যারা দরিদ্র ও অপুষ্টির শিকার তাদের কাছে দেশ, শিক্ষা ও রাষ্ট্র বিমূর্ত কিছু। হালের বলদের মতো তারা অধিকার সম্পর্কে নির্বাক এবং খাদ্য সংগ্রহ হচ্ছে তাদের দিবানিশির স্বপ্ন। অথচ তাদের শ্রমেই ঢাকা নগর হয়ে উঠেছে ক্রেতার নগর।

সন্ধ্যার পর দরিদ্র কৃষকের ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলে না। তবু বছর বছর পরিবারের লোকসংখ্যা বাড়ে। কমে যায় প্রকৃত মজুরি। একটি নতুন মুখ অপুষ্টির সম্ভাবনা ছড়িয়ে দেয় সমস্ত পরিবারে। দারিদ্র্য শুধু মানুষকে স্বাস্থ্যহীনই করে না, অদক্ষ শ্রমিকেও পরিণত করে। উদ্বৃত্ত শ্রমিক ও বেকারত্বের কারণে তারা নিয়োজিত হয় বিভিন্নমুখি শ্রমে।

ঊনবিংশ শতকে কৃষক সম্পর্কে একজন ইংরেজ মন্তব্য করেন, 'বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে। তার পক্ষে সঞ্চয় করা দূরে থাক, অধিক সুদে কর্জ নিয়ে বন্ধক থাকে।' সেই ইংরেজই লিখেছেন, 'কৃষকের দুরবস্থা দেখলে পাষাণতুল্য মনও করুণায় আর্দ্র হয়।' এরপর সমাজ কাঠামোতে ঘটেছে পরিবর্তন। ফসলের মওসুমে পথের পর পথ পেরিয়ে গেলে শোনা যায় সেচ পাম্পের মুখর শব্দ। দেখা যায় শস্যের ভারে নত মাঠের পর

মাঠ। জমিতে শস্য চাষের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে কৃষকের দারিদ্র্য। কারণ, উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল থেকে তারা বঞ্চিত। অন্যদিকে নদী শুকিয়ে যাওয়ায় বেকার হয়েছে জেলে ও মাঝি। স্বয়ংক্রিয় বস্ত্রকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি তাঁত শ্রমিকরা।

কৃষি জমিতে যন্ত্র ঢুকলেও কুটির শিল্প প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতির ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখানে রয়েছে প্রচল পুঁজির সংকট। গ্রামকেন্দ্রিক উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়েনি। ফলে ভেঙে পড়েছে কুটির শিল্প। তাঁতের শাড়ির ক্রেতা যে কৃষক শ্রেণী, তাদের প্রয়োজন থাকলেও ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে দরিদ্রের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে তাদের অধিকার হারিয়েছে তাঁতী। তাদের সুতোর টান অন্যের হাতে। এই সুতো চলে গিয়েছে মহাজন কিংবা কারখানা মালিকের হাতে। আর এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অসংখ্য সংখ্যক তাঁতী বেকার হয়েছে।

কৃষি কাজই হচ্ছে গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের প্রধান উপায়। আর এই কারণেই জমির উপর কৃষকের অধিকার এবং এর বিন্যাসের উপর অধিক শ্রমশক্তি নিয়োগের বিষয়টি নির্ভরশীল। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সবেচেয়ে ভয়াবহ দিক হচ্ছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কর্মসংস্থানের সংকট।

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন কাঠামোর দুই ধরনের প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত উৎপাদনের উপর ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রভাব এবং দ্বিতীয়ত উপনিবেশ উত্তরকালে উৎপাদন সম্পর্কের বিকৃত পরিবৃদ্ধি। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণে একটি শ্রেণী ক্রমাগত কর্মহীন, ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের জোতদার, মহাজন ও ধনী কৃষক আত্মসাৎ করেছে বিপুল পরিমাণ দরিদ্র কৃষকের জমিজমা, বসতবাড়ি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটলেও গরিব কৃষকের কোনো উপকার হয়নি। কারণ, গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকরাই বলীয়ান ছিল। তাই নতুন ভূমি ব্যবস্থার ফলে ধনী কৃষকরাই উপকৃত হয়েছে।

যেখানে ট্রাকটর আসা উচিত ছিল সেখানে এসেছে হাজার হাজার কোটি টাকার সার কারখানা। সেই সঙ্গে এসেছে বিদেশী বিশেষজ্ঞ। কোনো রকম দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ছাড়াই এর ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অদক্ষ পরিচালকদের হাতে। এসেছে আধুনিক প্রযুক্তি। কিন্তু চালাবার মতো দক্ষ লোকের অভাবে অর্জিত হয়নি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা। জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা

ছাড়াই আমদানি করা হয়েছে লাখ লাখ টন সার। পরিনামে মাটির জৈব পদার্থ হ্রাস পেয়েছে। সেচ পাম্পের অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভের পানির স্তর নিচে নেমে গিয়েছে। এভাবেই কৃষি কাজে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সংকট।

উন্নত বিশ্বের অটোমেশন ও তৃতীয় বিশ্বের শ্রম শক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সংঘাত। কর্ম হরণের প্রযুক্তি ভবিষ্যতে কি নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে, না এনে দেবে উৎপাদন সাফল্য? এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। পেশীর বিপরীতে এসেছে বাষ্প ইঞ্জিন, মেধার বিপরীতে উৎপাদনে বিপ্লব এনেছে অটোমেশন। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণ এর সুফল পায়নি। জনগণ ভাগ হয়ে আছে দুই ভাগে- ধনী ও দরিদ্র। সভ্যতারও দুই ভাগ-সুইচনির্ভর ও পেশীনির্ভর। ফলে শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষ তার শ্রমের ফসল থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে বলেই মানুষ অপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন হচ্ছে মানবসত্তা থেকে। শ্রমিক কাজ করে, তাঁত বোনে, সুতো কাটে, মেশিন চালায়, পাথর ভাঙে, খনন করে, মাটি কাটে, প্রাসাদ বানায়, কৃষক লাঙল চালায়, ফসল বোনে, ফসল কাটে। শ্রমিক ও কৃষক জানে তাদের শ্রমে নির্মিত এ সকল জিনিস তাদের জন্য নয়। সোনালি ধানে নত হয়ে আসা শস্য ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একজন কৃষককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ধান ঘরে তুলছেন, অভাব কিসের?' অত্যন্ত সহজভাবে সেই কৃষক উত্তর দিয়েছিলেন, 'এই ধান আমি পাব না।' তার উত্তর অত্যন্ত সহজ, অথচ বড়ই মর্মান্তিক।

অটোমেশনের ভয়ে যেখানে উন্নত বিশ্ব অস্থির সেখানে আমাদের দেশের মানুষ গরুর গাড়ি কিংবা ঠেলা গাড়ির ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একই রাস্তায় চলছে পেট্রোল চালিত মোটর যান এবং ঠেলা গাড়ি। টিভিতে প্রদর্শিত হয় রূপকথার দৈত্যের পরিবর্তে সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান, পরী কন্যার পরিবর্তে হাজির হয় বায়োনিক ওম্যান। অথচ এদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ভাঙে নদীর ভাঙনের সঙ্গে। চারদিকে শুধু ভাঙন। পরিবারের ভাঙন, সমাজের ভাঙন, মূল্যবোধের ভাঙন। এ ভাঙনের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নগর ও গ্রামের ব্যবধান। পরিবেশ চেতনা একে দান করেছে নতুন প্রেক্ষিত। মাটির ক্ষয়, বৃক্ষের ক্ষয়, নদীর ক্ষয়, পানির ক্ষয় ও বন্যপ্রাণীর ক্ষয় মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির।

পদ্মার তীরে জনগণ

পদ্মার তীরে আছে অনেক গ্রাম, সেখানে উৎসব হয়। উৎসবের শেষ নেই। চৈত্র-সংক্রান্তি, নবান্ন, নববর্ষ, পীর-সন্ন্যাসীর নামে উৎসব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে রথ উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। গোলাপ নগরের আবুল কালাম বলেন, 'আমার দেশে পদ্মার তীরে বাজারে বাজারে মেলা বসে। কুষ্টিয়ায় বসে লালন ফকিরের মেলা।'

আগে ফসলের মৌসুমে কৃষকদের মধ্যে কেনা-কাটার ধুম পড়ে যেত। এখন জীবন সংগ্রামের অমিততেজ গম্ভীর, বিষণ্ন ও নিরুৎসব। টিকে থাকার নির্মম লড়াইয়ে পদ্মার তীরের মানুষ ক্লান্ত। ঝাঁক ঝাঁক ইলিশের স্বপ্ন ঝরা পাতা হয়ে ওড়ে। চারদিকে ধ্বংসের খেলা। কালবৈশাখি ঝড় জনপদে আঘাত হানে, বৃষ্টি হলে ঘরের মধ্যে পানি পড়ে, শীতের আঘাতে হাড় কাঁপে, বর্ষার পানি ঘরে ঢোকে, বন্যায় জনপদ ভেসে যায় এবং শুকনো মৌসুমে পদ্মার বুক খালি হয়ে যায়। মানুষের মন পানির জন্য হাহাকার করে ওঠে। ফসল মৌসুমের অভ্যর্থনা বিষাদগ্রহস্ত করে কৃষকের মন। পদ্মার তীরের জনপদ হয়েছে ধ্বংসের মুখোমুখি। অথচ প্রাচীনকালে জনপদগুলোর সৃষ্টি হয়েছে।

গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীন জনপদ বঙ্গ। গঙ্গা-ভাগীরথী ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা। একাদশ দশকে ছিল বঙ্গের দুটি ভাগ-উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা। সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণাঞ্চল ছিল খাল-বিল সমাকীর্ণ সমুদ্র, উপকূল। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনা

মোহনা পর্যন্ত সমুদ্র শায়িত অংশকে বলা হতো সমতট। যুগে যুগে বাংলার নিসর্গ ভূমির পরিবর্তন ঘটেছে নদীর গতির সঙ্গে সঙ্গে। আর বাংলাদেশের জনগণকে চরিত্র দান করেছে নদী। উঁচু ভূমি থেকে যে পলি সমুদ্র ও নদীর মোহনায় জমা হয়েছে, তাতেই গড়ে উঠেছে বাংলা ব-দ্বীপের নিম্নভূমি। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব অংশ বাদ দিলে বাংলার সবটুকু পলি জমাট মাটি। নতুন জমির উপর দিয়ে বাংলার নদীগুলো কত বার খাত পরিবর্তন করেছে তার হিসাব নেই। কৃত্তিবাসের আমলে গঙ্গার দক্ষিণ প্রবাহকে বলা হতো ছোট গঙ্গা; পূর্ব প্রবাহকে বলা হতো বড় গঙ্গা। বড় গঙ্গাই পদ্মা নামে পরিচিত। এর রূপ ছোট গঙ্গার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। পদ্মার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় দশম ও একাদশ শতকে। আসলে পদ্মা এর চেয়েও বেশি প্রাচীন। দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা-ফরিদপুর পর্যন্ত পদ্মার প্রবাহের অস্তিত্ব ছিল। পদ্মার একটি প্রাচীন পথ রাজশাহীর রামপুর, বোয়ালিয়া হয়ে চলন বিলের ভেতর দিয়ে ধলেশ্বরী খাত দিয়ে ঢাকাকে পাশে রেখে মেঘনা খাড়িতে মিশেছিল। ঢাকার পাশে এই নদীর নাম হচ্ছে বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গাই হচ্ছে প্রাচীন গঙ্গার খাত। পদ্মার যে কয়েকটি শাখা নদী সমুদ্রে পড়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে কুমার। মধ্যযুগে ভৈরব ছিল অন্যতম শাখা নদী।

পদ্মার তীরে হয়েছে বঙ্গ জনপদের কৃষির পত্তন। দুই তীরে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি, নগর, গ্রাম, বাজার, বন্দর ইত্যাদি। জনসংস্কৃতির সৃষ্টি পুরাণ, ভয়-বিশ্বাস, স্বভাব-প্রকৃতি, স্বপ্ন-কল্পনার সঙ্গে মিশে আছে নদীর সংস্কৃতি। এ দেশের নদীই জনগণের জীবনকে দান করেছে গতি। তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে নৌ সংস্কৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার যে চেহারা ছিল, তার এখন পরিবর্তন ঘটেছে। এমনকি নদীগুলোও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। যুগ যুগ ধরে এই জনপদকে বারি সিঞ্চিত করেছে পদ্মা। রাক্ষসী পদ্মা গ্রাস কেরছে দুই তীরের হাজার জনপদ। তাই তার আরেক নাম কীর্তিনাশা। তবু পদ্মার সঙ্গে এদেশের এক-তৃতীয়াংশ জনপদের জীবন-মরণ সম্পর্ক।

পদ্মার তীরের মানুষকে তাদের জনপদ গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পদ্মা থেকে আহরণ করেছে বাঁচার উপকরণ। নদী ঘর ভাঙে, শস্য কেড়ে নেয়। গ্রাস করে একের পর এক জনপদ। আগুনে পুড়লে ভিটা থাকে; কিন্তু নদীতে ভাঙলে কিছুই থাকে না। পদ্মার তীরের মানুষ বার বার সর্বহারা হয়েছে। বাঁচার লড়াইয়ে তারা পরাজিত হয়নি। বঙ্গ জনপদের জনগণ সুপ্রাচীনকাল থেকেই লড়াই করছে। বঙ্গ সভ্যতার অবদানের মূলে শত শত নদ ও শাখা নদীর রয়েছে ব্যাপক অবদান। পদ্মার শাখা কুমার নদীর তীরে রয়েছে সভ্যতার পাদপীঠ। আলেকজান্ডারের

আমলে এখানেই গড়ে উঠেছিল গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্র গঙ্গাবন্দর। তখন সমুদ্র বিস্তৃত ছিল ফরিদপুর পর্যন্ত। গঙ্গাবন্দরের সঙ্গে রোম, মিসর, চীন, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপুঞ্জসহ অনেক এলাকারই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এখান থেকে স্বর্ণ, মণি-মুক্তা, রেশম-কার্পাস তুলোর বস্ত্র, মশলা এবং সমরোপকরণ হিসাবে হাতি রফতানি হতো। টলেমি উল্লেখ করেছেন, বঙ্গে স্বর্ণখনি আছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলো চিহ্নিত করার সময় ব্যবহৃত হতো নদীর রেখা। বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র ছিল খুবই বিখ্যাত।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলকে বলা হতো বরেন্দ্র। তেমনি ভাগীরথী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চল পরিচিত ছিল গৌড় রূপে। প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছিল নদীগুলোর সংযোগ স্থলে। তার মধ্যে পদ্মা ও মেঘনা সংযোগ স্থল অন্যতম। এসব সংযোগ স্থলের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে যাতায়াত করা সহজ সাধ্য ছিল।

গঙ্গার জন্ম হয়েছে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ঢালে ২৩ হাজার ফুট উচ্চতায়। হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে প্রায় সাত শত মাইল জুড়ে রয়েছে গঙ্গা অববাহিকার উত্তর সীমানা। ভারতের মধ্য দিয়ে এক হাজার মাইল পার হয়ে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চীন, নেপাল ও ভারতের কয়েকটি উপনদী গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। ফারাক্কা থেকে এগার মাইল ভাটিতে গঙ্গা রাজশাহী সীমান্তে প্রবেশ করেছে। এরপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হয়ে গঙ্গা গোয়ালন্দের কাছে এসে যমুনার সঙ্গে মিলেছে। পদ্মা-যমুনার মিলিত ধারা চাঁদপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। চাঁদপুরের কাছেই পদ্মা মিলিত হয়েছে মেঘনার সঙ্গে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর মিলিত স্রোত নিম্ন-মেঘনা নামে এক বিশাল ব-দ্বীপ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ফারাক্কার ভাটিতে একটি উপনদী মহানন্দা। এর এক অংশ ভারতে, অন্য অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত। পদ্মার দুটি শাখা নদী হচ্ছে বরাল ও গড়াই। নদী দুটির পুরো প্রবাহ-ই বাংলাদেশে অবস্থিত।

গঙ্গাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র নদী, যার উৎস হিমালয়ের তুষার গলা অঞ্চল। সারা বছরই গঙ্গার খাতে পানি থাকে। ভাগীরথী-হুগলী ও পদ্মা-মেঘনার মাঝখানে অবস্থিত ত্রিভুজাকৃতির বিশাল অঞ্চলটি গঙ্গার ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। ব-দ্বীপের প্রধান অংশটি বাংলাদেশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে এর সামান্য অংশ। ফারাক্কা পার হয়ে গঙ্গা দক্ষিণ দিকে একটি শাখা বিস্তার করেছে, যার নাম ভাগীরথী। গঙ্গার মূল প্রবাহকে ভাগীরথী খাতে প্রবাহিত করার জন্য গঙ্গার উপরে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধের

পেছনে অবস্থিত জলাধার। জলাধার থেকে ছাব্বিশ মাইল দীর্ঘ একটি খাল আড়াআড়িভাবে ভাগীরথীর খাতে মিশেছে। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে গঙ্গার পানি ভাগীরথীর খাতে পড়া শুরু করেছে। এর ফলে পদ্মার গতি ব্যাহত হয়েছে। এমনকি ভাগীরথীর প্রভাবে কলকাতার নাব্য পথে পলি জমা হয়েছে। হলদি নদী ও হুগলীর মোহনায় নদী খাত হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে যাওয়ায় স্রোতের গতিবেগ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে মরু প্রক্রিয়া।

বিক্রমপুর, ফরিদপুর ও বরিশালের পদ্মা নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নগর ও উপনগর। কীর্তিনাশার করাল গ্রাসে তা অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়েছে। শরিয়তপুরের ফতেজঙ্গপুর এলাকায় রয়েছে মোগলদের যুদ্ধাভিযানের স্তম্ভ ও সমরাস্ত্র সংরক্ষণশালা। রাজনগরে নির্মিত দেওয়ান রাজবল্লভের অভ্রভেদী অট্টালিকা, সপ্ত রত্ন ও একবিংশ রত্ন কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে। কীর্তিনাশা গ্রাস করেছে আরো অনেক রাজরাজাদের কীর্তি। এখন আর সেই নদী নেই। নদীর দু'কূল ভরাট হয়ে গিয়েছে। সেখানে আবাদি জমি। শুকনো মৌসুমে সেচ পাম্প দিয়েও মাটির গভীর থেকে পানি তোলা যায় না। তাই জমি চাষেও কৃষকদের উৎসাহ নেই। অবহেলায়-অনাদরে অনেক স্থানে গড়ে উঠেছে ঝোপ-ঝাড় ও জংলি কাঁটা। নদী খাতে শুকনো মৌসুমে পানি থাকে না। এমনকি কোনো কোনো স্থানে নদী খাতের চিহ্ন সমতল ভূমির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

শরিয়তপুরের অন্তর্গত রাজনগরে ছিল রাজা রাজবল্লভের বাসস্থান। কীর্তিনাশা নদীগর্ভে তা বিলীন হয়েছে। পদ্মার জনপদগুলো বিভিন্ন সময় দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছে। ১৮৯৬ ও ১৯০৬ সালে শরিয়তপুরের ব্যাপক এলাকা দুর্ভিক্ষের শিকারে পরিণত হয়। ফড়িং ও পোকার আক্রমণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবার ফলে এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় পদ্মার ইলিশ মাছ খেয়ে অনেকে জীবন ধারণ করেছে বলে কথিত রয়েছে। শুধু পদ্মার ভাঙনই নয়, প্রবল বন্যার তোড়ে পদ্মার দুই তীরের জনবসতি ভেঙে গিয়েছে বার বার। ১৭৮৭, ১৮২৪, ১৮৩৮, ১৯০৭, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৪, ১৯৮৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় হাজার হাজার ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে। ব্যাপক জানমাল ও ফসলের ক্ষতি হয়েছে। গবাদিপশু মরেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পদ্মার তীরের মানুষ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে। নদীবাহিত পলিতে কৃষি জমি উর্বর হয়ে ওঠে। তাই কম পরিশ্রমে বেশি ফসল ফলে। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, পাট, আখ, শর্ষে, পেঁয়াজ, চিনাবাদাম, আলু, মরিচ ইত্যাদি।

পদ্মার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কাগজের নৌকার মতো দুলে উঠত স্টিমার। মাঝে মধ্যে দুই টুকরো হয়ে যেত পানসী নাও। তবু উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে জেলেদের

ছিল বসবাস। জীবনকে বাজি রেখে তারা আক্রোশী পদ্মার সঙ্গে রাত কাটিয়ে দিত। পদ্মাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল মৎস্যজীবী শ্রেণী। পদ্মার তীরে তীরে রয়েছে তাদের বসতি। অকুতোভয় মাঝির রণক্ষেত্র ছিল পদ্মা। পদ্মার নিঃসীম জলরাশির সঙ্গে দিগন্ত মিশে একাকার হয়ে যেত। পদ্মা দর্শনে গিয়ে সমুদ্রের বিশালতা অনুভব করত মানুষ। ইলিশের স্বপ্নে নীল হয়ে উঠত জেলেদের চোখ। যেই স্বপ্ন ও সংগ্রামের মহিমা নিয়ে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষের জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তা আজ অবলুপ্ত আবেগ মাত্র। যে আশায় এদেশের মানুষ উদ্দীপ্ত হয়েছে, সেখানে আজ ধু-ধু বালিয়াড়ি। পদ্মার তীরের জনগণ স্বপ্ন ভঙ্গের আর্তনাদে মুখ থুবড়ে পড়েছে বালির স্তূপে।

আঠার শতকের পদ্মার আক্রোশ ছিল সর্বগ্রাসী। সেই সময়ে পদ্মার করাল গ্রাসের ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল পুরান কীর্তিগুলো। তখন পদ্মার তীরে ছিল মনোরম বনভূমি। তা সত্ত্বেও পদ্মার তীরের জনপদগুলো শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে ছিল অন্ধকার আচ্ছন্ন। সে সময়ে মানুষের জীবন সংগ্রামে ছিল অমিত তেজ ও দীপ্তি। তখন পদ্মার তীরে সংঘটিত হয় কৃষক ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। ফলে সরকার তটস্থ হয়ে পড়ে। তাদের প্রশাসন পরিচালনা ও কর আদায়ে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রশাসনকে শক্তিশালী করার স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে মন দেয়। তারা পদ্মার তীরে রেল লাইন সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়। ব্রিটিশ সরকারের প্রথম দিকে শিয়ালদহ থেকে পদ্মার পশ্চিম তীরে গোপালনগর ও দামুকদিয়া পর্যন্ত এবং পূর্ব তীরের সাঁড়া স্টেশন থেকে সিরাজগঞ্জ ও সান্তাহার পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ করা হয়। সাঁড়াঘাট ও দামুকদিয়াতে ট্রেন আসত। আর নদী পারাপার চলত স্টিমারে।

ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘ বিশ বছর জরিপ করার পর পদ্মার উপরে রেল সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। সেতুটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় ১৯১৫ সালে। তৎকালীন ভাইস রয় লর্ড হার্ডিঞ্জ যাত্রীবাহী ট্রেনের উদ্বোধন করেন। তার নামানুসারে সেতুটি নাম করা হয় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। সেতুটির বিশেষত্ব হচ্ছে এর গভীরতা। সেতু নির্মাণের সবচেয়ে প্রযুক্তিগত সাফল্য হচ্ছে পদ্মা নদীর গতি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই সেতুর একটি স্প্যান ভেঙে নদীতে পড়ে যায়। স্প্যানটির একপ্রান্ত সেতুর স্তম্ভে আটকে থাকে এবং অন্য প্রান্ত নদী গর্ভে পড়ে যায়। নবম স্প্যানটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাধীনতার পর পর সেতুটি মেরামত করা হয় এবং তা ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর আবার উদ্বোধন করা হয়।

ভারত কর্তৃক একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করার ফলে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পানির অভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২৮ মার্চ পদ্মা নদীতে পানি প্রবাহ ছিল দশ হাজার কিউসেকের কম। অথচ ১৯৭৫ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালু হবার পর ১৯৮৮ সালে শুষ্ক মৌসুমে সর্বনিম্ন পানির প্রবাহ ছিল ৩০ হাজার কিউসেক। পদ্মার পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবার ফলে দেশের একশত ২৬ মাইল অভ্যন্তরে সমুদ্রের লোনা পানি প্রবেশ করেছে। ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে পদ্মা নদী প্রশস্ত ছিল এক হাজার ৬০০ মিটার। ১৯৯৩ সালের ২৮শে মার্চ তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬০০ মিটারে। পদ্মার প্রশস্ততা হ্রাস পাবার ফলে পদ্মার দু'তীরে বালির স্তূপ জমে গিয়েছে। টিউবয়েল অচল হয়ে গিয়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে খাবার পানির তীব্র সংকট।

পদ্মা থেকে একতরফাভাবে ভারত কর্তৃক পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার একর উর্বর জমি অনুর্বর জমিতে পরিণত হয়েছে। এতে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। পদ্মার তীরের বিভিন্ন এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের অস্তিত্ব হয়েছে হুমকির সম্মুখীন। পানি প্রবাহের অভাবে-ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গিয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে মরু প্রবণতা। পদ্মা শুকিয়ে যাবার ফলে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে মরু প্রবণতা।

পদ্মার তীরের মানুষের জীবন পদ্মার সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে। তাদের জীবনে ছিল হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। মানব শিশুর অভ্যর্থনায় পদ্মার জনপদে ধ্বনিত হয়েছে জন্মের চিৎকার। পদ্মার তীরে বাজারগুলোতে যাত্রা, কবিগান, গম্ভীরার আসর বসেছে। শুকনো মৌসুমে মেলা ও উৎসবে মুখর হয়েছে। কৃষক, কামার, কুমার, কাঁসারি ও তাঁতিরা নিজেদের পণ্যের পসার বসিয়েছে পদ্মার তীরে বাজারে বাজারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মার মাঝি উপন্যাসে লিখেছেন, 'বাজারে টিনের চালার নিচে যেখানে তরিতরকারির দোকান বসে সেখানে যাত্রার আসর বসিয়াছে, লোক জমিয়াছে ঢের। কুবের এক পাশে বসিয়া পড়িল। পানবিড়ির দোকান ছাড়া এত রাত্রে পসরা সাজাইয়া কেহ নাই, রূপ-কন্যারাও যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। পেশাদার দল নয়, আলু-বেচা তেল-বেচা মানুষের সখের দল, অনেকের হয়তো পড়িতেও জানে না, একে ওকে দিয়া পড়াইয়া শুনিয়া পার্ট মুখস্থ করিয়াছে, শক্ত শক্ত অনেক শব্দই উচ্চারণ হয় না, তাই হাস্যকর রকমে ভাঙিয়া জিহ্বার উপযোগী করিয়া নিয়াছে......। বালক লখীন্দরের পাশে তার চেয়ে এক হাত বেশি লম্বা বেহুলা নির্বিকার চিত্তে পার্ট বলে গলাটি মিহি বলিয়া আর চমৎকার মেয়েলী ঢঙে

অভিনয় করিতে পারে বলিয়া ওকে বেহুলা করা হইয়াছে, আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।' তবু রাত জেগে জেলেরা যাত্রা শুনত। ভাঙা হারমোনিয়াম আর ভ্যাপসা তবলার সুরে আসর মুখর হয়ে উঠত। মনসা, চাঁদ সদাগর ও লখীন্দরের কাহিনী পদ্মার জনপদে মানুষের মুখে মুখে ছিল। সে কাহিনী শোনার জন্য তারা শীত মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করত। পদ্মার তীর ঘেঁষে ছিল জেলে পাড়া। ফাঁকা জায়গার অন্ত ছিল না। তবু জেলেপাড়াগুলো গায়ে গায়ে ঘেঁষে জমাট বেঁধে গড়ে উঠেছিল। এ অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলো নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহার নির্ধারিত খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়েঘর উঠিতে পায়। পুরুষাণুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিয়াছে।' ঋতুচক্রে পদ্মা পাক খায়। পদ্মার ভাঙন ধরা তীর ধসে পড়ে। পদ্মার বুকে আবার চর জেগে ওঠে। পদ্মার আক্রোশের মুখে শতাব্দীর প্রাচীন ভূমি ও নগর বিলীন হয়ে গিয়েছে। এর পরিবর্তে জেগে উঠেছে অনুর্বর বালুচর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'পদ্মা তো কখনও শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কে জানে। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনো দিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।'

এমন এক সময় ছিল পদ্মার অসীম জলরাশি বাধা অতিক্রম করে তীরের রেখা দেখা যেত না। স্টিমারের শব্দে পরিবেশ মুখর হতো, কিন্তু পদ্মার বুকে পানির কাঁপন ধরত না। মানিকের ভাষায়, 'আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন ধরা তীরের শুভ্র কাশ ও শ্যামল তনু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারা জীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মার যে ভয়াল রূপ দেখেছেন, এখন তা নেই। পদ্মার অসীম জলরাশি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত মানুষের বুকে জেগে উঠেছে হাহাকার। ফসল রোদে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মাঝির ছেলে হয়েছে মুটে। জেলের ছেলের হয়েছে মুচি। পাবনার জেলে গগন দাস বলেন, 'পদ্মার বুকে সত্তর হাত পানির নিচে জাল ফেলে ইলিশ মাছ

ধরতাম। রূপার খনি ছিল পানির মধ্যে। মনে হতো, পদ্মা থাকলে আমরা বেঁচে থাকব। পদ্মার সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হলেও জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়নি। পাহাড় সমান তরঙ্গের শিখরে উঠে নৌকা ধপাস করে ঢেউয়ের খাদে পড়ে যেত। কিন্তু আমরা ভয় পেতাম না। বরং আমাদের নৌকা বেশি ইলিশের আশয় কাটালের দিকে ছুটে যেত। ইলিশের খনিতে এখন বালির স্তূপ। আমার ছেলে এখন মুচি।'

ঝাঁক ঝাঁক ইলিশের স্বপ্নে বিভোর জেলের চোখে এখন দুঃস্বপ্ন। জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে অর্ধাহারে অনাহারে জীবন কাটায়। পদ্মার বুকে অসীম জলরাশির পরিবর্তে যেমন বালুরাশি স্তূপীকৃত হয়ে আছে, তেমনি জেলেদের মনে স্তূপীকৃত হয়ে আছে জীবনের গ্লানি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। পদ্মার জলরাশির কেন্দ্রভূমি ছিল হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। এখন শুকনো মৌসুম এলেই দেখা যায়, ব্রিজের স্প্যানগুলো বালুচরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে বালির মধ্যে মানুষের পায়ে চলার পথ। বাস, ট্রাক, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি চলাচল করে একই পথ দিয়ে। বাতাসে ওড়ে বালি। বালির মধ্যে চাষ করা হয় চীনাবাদম। চর রূপুরের কৃষক নূরুল ইসরাম বলেন, ''জমিতে চীনাবাদাম চাষ করছি। চীনাবাদামের গাছের গোড়া থেকে বালি উড়ে যাওয়ার ফলে গাছের গোড়া হাল্কা হয়ে গিয়েছে। ধূ-ধূ বালির স্তূপের শেষ নেই। দক্ষিণে যত যাওয়া যায় বালির স্তূপ তত বেশি। পানির অভাবে পদ্মার তীরের মানুষ হাহাকার করে। চাষের পানি নেই। খাবার পানি নেই। অথচ বন্যার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছি আমরা। পানির অভাবে মাছ শেষ হয়ে গিয়েছে। বন-বাদার উজাড় হয়ে গিয়েছে। বন্যা ও ঝড়ে আম-কাঁঠালের বন শেষ হয়েছে। পদ্মা নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে দুই তীরের বনভূমি। পানি নাই, গাছ নাই, পাখি নাই। ধান হয় না। পাট হয় না। আমরা বাঁচব কি করে? আমাদের যৌবনকালে পদ্মার ফোঁস ফোঁস শব্দে মানুষ ঘুমাতে পারত না। তাই ঝড়-বাদলের দিন তারা জেগে থাকত। আট-দশ মাইল দূর থেকেও পদ্মার গর্জন শোনা যেত। তখন কৃষক, জেলে, মাঝি কারো কাজের অভাব ছিল না। এখন খরার সময় আমরা রোদে পুড়ি। বর্ষার সময় বানে ভাসি।''